উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychological Foundation of Education
Course Code : 5CC-ED-02

First Print : November, 2024
Print Order : SC/DTP/340. 19/11/2024

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychological Foundation of Education
Course Code : 5CC-ED-02

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :
Dr. Mukti Ganguly
Former Professor SoE, NSOU

: Course Editor :
Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

: Format Editing :
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)

UG : HONOURS
PSYCHOLOGICAL
EDUCATION

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychological Foundation of Education
Course Code : 5CC-ED-02

পর্যায়-১

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)

একক ১ ❑ মনোবিদ্যা—ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি (Concept, Nature and Scoppe of Psychology) 9-22

একক ২ ❑ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে মনোবিদ্যা (Psychology as the Foundation of Education) 23-29

একক ৩ ❑ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা, প্রকৃতি এবং গুরুত্ব (Psychology : Concept, Nature and Significance) 30-37

পর্যায়-২

বৃদ্ধি এবং বিকাশ (Growtsh & Development)

একক ৪ ❑ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth & Development of a child) 41-50

একক ৫ ❑ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী : জৈবিক আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক (Perspectives of Educational Psychology : Biological, Behavioral and Cognitive) 51-55

একক ৬ ❑ বিকাশগত পর্যায় এবং তার শিক্ষাগত প্রভাব (Developmental stages and its impact on Eduication) 56-81

পর্যায়-৩

বিকাশের তত্ত্ব (Theories of Development)

একক ৭ ❑ পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Piaget's Cogiutive Development Theory) 85-95

একক ৮ ❑ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব (Erikson's Psycho-Social Development Theory) 96-105

একক ৯ ❑ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's moral Developmental Theory) 106-114

পর্যায়-৪

শিখনের মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process of Learning)

একক ১০ ❑ স্মরণ ক্রিয়া (Memory) 117-133

একক ১১ ❑ মনোযোগ ও আগ্রহ—ধারণা, নির্ধারক ও শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ (Attention and Interest—concept, determinant and classroom applications) 134-144

একক ১২ ❑ প্রেষণা—ধারণা, শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য), তত্ত্বসমূহ, প্রেষণার প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ও শিক্ষাগত তাৎপর্য (Motivation—Concept, types, characteristics, Theories and Factirs affecting motivation on and educational implications) 145-160

পর্যায়-৫

মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health)

একক ১৩ ❑ মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Health and Mental Hygiene) 163-168

একক ১৪ ❑ সংগতিবিধান (Adjustment) 169-180

একক ১৫ ❑ অপসংহতি (Maladjustment) 181-191

পর্যায়-১

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান

(Educational Psychology)

একক ১ ❑ মনোবিদ্যা : ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি (Concept, Nature and Scope of Psychology)

গঠন (Structure)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ ভূমিকা (Introduction)

১.৩ মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Psychology)

১.৪ মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Psychology)

১.৫ মনোবিদ্যার পরিধি ও পদ্ধতি (Scope and Method of Psychology)

১.৫.১ মনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Psychology)

১.৫.২ মনোবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি (Method of Psychology)

১.৬ সারাংশ (Summary)

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Question)

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা—

- মনোবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার সাথে মনোবিদ্যার সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।
- মনোবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- মনোবিদ্যার পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

১.২ ভূমিকা (Introduction)

মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে তুলনামূলকভাবে নবীন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনোবিদ্যার পৃথক

অনুশীলনের প্রস্তাব করেছিলেন। আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিদ্যার প্রথম আবির্ভাব। দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স বলেছিলেন “Psychology is the Science of Consciousness”. অর্থাৎ মনোবিদ্যা হল চেতনার বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞান সর্বাধুনিক সংজ্ঞা হল “মনোবিজ্ঞান হল অভিযোজন প্রক্রিয়া অনুশীলনের বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করলেও একে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। মনোবিদ্যার মধ্যে বিশেষীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মনোবিদ্যার পৃথক পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে।

মনোবিজ্ঞানের ধারণা, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি, মনোবিজ্ঞানের পরিধি, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে তথ্য নীচে প্রদত্ত হইল—

১.৩ মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Psychology)

মনোবিজ্ঞান বিষয় হিসেবে তুলনামূলকভাবে নবীন, যদিও প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল মনোবিজ্ঞানের পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ‘Psychology’ যা গ্রিক শব্দ ‘Psyche’ ও ‘logos’ থেকে এসেছে। ‘Psyche’ কথার অর্থ হল আত্মা (Soul) এবং ‘Logos’ শব্দের অর্থ হলো বিজ্ঞান (Science) অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞান হল মনোবিদ্যা (Psychology is the science of soul)। প্রাচীনকালে গ্রিক মনোবিদরা মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা অনেকের কাছে মনঃপুত হল না। কেননা আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের মতে আত্মা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণযোগ্য নয় তাই এর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। আত্মা নিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না তাই একে আত্মার বিজ্ঞান বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞান ‘মন’ এর বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত হয়। মনোবিদ হফডিং (Hoffding) বলেন মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান (Psychology is the science of mind), কিন্তু এই ধারণাটি পরবর্তীকালে বিভিন্ন মনোবিদরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের মতে মন শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মন সম্পর্কেও দার্শনিকগণ এর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল তাই বলেন মন হল বিমূর্ত ধারণা, তাছাড়া আত্মার মত মনও পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য ও পরীক্ষণ সাপেক্ষ নয় তাই এই বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

ভুণ্ড (Wundt), টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিগগণ মনোবিজ্ঞানকে চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Science of consciousness) হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান সংজ্ঞাটি পূর্বের সংজ্ঞা দুটি থেকে উন্নত, কারণ চেতনাকে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য ‘অন্তদর্শন’ পদ্ধতি ব্যবহার

করা হয়। এই প্রথম মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি উল্লিখিত হয়। অন্তদর্শন হল কোনো বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতা কালে (যেমন—ভয়, রাগ ইত্যাদি) নিজেকে দেখা। ব্যক্তির অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা ব্যক্ত করাই হল 'অন্তদর্শন'। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শুধু 'চেতন মন'ই মন নয়, 'প্রাক্‌চেতন' ও 'অবচেতন' মন মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাই মনোবিজ্ঞানীন 'চেতন মনের বিজ্ঞান' এই সংজ্ঞাটি আংশিক। McDougall এর মতে, মনোবিজ্ঞান শুধু চেতন মনের বিজ্ঞান হলে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিশুর আচরণ বা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। এছাড়া পদ্ধতি হিসাবে অন্তদর্শন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের সামান্যীকরণ সম্ভব নয় যা বিজ্ঞানের অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানকে 'আচরণের বিজ্ঞান' বলে গণ্য করা হয়। Watson, McDougall, Woodworth প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতের সমর্থক, যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

মনোবিদ ওয়াটসন Watson-1904) বলেন, মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is a science of behaviour)। মনোবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয় তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি যে বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়াতীত ও যেগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ নয় সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। আচরণ হল পর্যবেক্ষণযোগ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন একটি শিশু ভয় পেয়েছে যদি একে আত্মা, মন, চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় তবে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি শিশুটি ভয়ের ফলে কী ধরনের আচরণ করেছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অর্থাৎ শিশুটির বাহ্যিক আচরণগুলিকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক আচরণ যথা মাংসপেশির সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে অনেক মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব এবং এটাই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পরবর্তীকালে মনোবিদ Mc. Dougall বলেন, 'Psychology is the positive science of behaviour of living things.' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান।

Mc. Dougall-এর সংজ্ঞার সঙ্গে Watson-এর সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

Watson প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিদদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ তাঁরা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

অপরদিকে Mc. Dougall বলেন, জড়বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোয়।

Desigerato, Howies ও Jackson প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে, মনোবিজ্ঞান হল মানুষসহ প্রাণীর আচরণ ও ওই আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ। মনোবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে Watson-এর ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আচরণবাদী মনোবিদ Woodworth বলেন, 'Psychology is the science of activities in relation to his environment'। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রেক্ষিতে ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞান। Woodworth তাঁর সংজ্ঞায় activities বা ক্রিয়াকলাপ বলতে প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন এবং পারিপার্শ্বিক বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে আচরণবাদীদের বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় "মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিভাগ, গতিপ্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেহগত প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করে।" এ যাবৎকাল মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হল আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ—

1. **মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psychology is positive science) :** মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি। ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বা কোনো আদর্শের নিরিখে নয়, যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি।

2. **মনোবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-সাপেক্ষ (Psychology has with observable and experimentable facts) :** মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরীক্ষণ-সাপেক্ষ। কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

3. **আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসাবে মানসিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব (Importance on mental process in explaining behaviour) :** উডওয়ার্থের মতে, আচরণ বলতে এখানে শুধুমাত্র বাহ্যিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আচরণ বলা হয়নি, অভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও ভূমিকার কথাও ব্যক্ত হয়েছে এবং সে জন্যই অন্তদর্শনের গুরুত্বও এখানে স্বীকৃত।

4. **আচরণ হল প্রাণী ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফল (Behaviour results from the interaction between organism and environment) :** জীব ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাই হল 'আচরণ'। অর্থাৎ প্রাণী ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলই আচরণ।

5. **মনোবিজ্ঞানে দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ (Psychology deals with both physical and mental processes) :** এই সংজ্ঞায় জীবের দৈহিক ও মানসিক

উভয় ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এখানে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন জার্মানির প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frued), যিনি মনোবিশ্লেষণের জনক বলে পরিচিত। তাঁর মতে, মনোবিশ্লেষণ হল মানুষের আচরণকে অবচেতন মনের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার জন্য কৌশল ও তত্ত্ব সংগ্রহ। মনস্তত্ত্বের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব (Cognitive Psychology) এবং মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্ব (Humanistic Psychology)।

6. **প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব (Cognitive Psychology) :** প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই মনস্তত্ত্ব যা মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করে। যেমন— কীভাবে আমরা চিন্তা করি, প্রত্যক্ষণ করি, স্মরণ করি এবং শিখি। এর মূল বিষয় হল কীভাবে মানুষ তথা অর্জন করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং স্মরণ করে। এর আধুনিকতম ধারণা হল 'Meta Cognition' (অধি প্রজ্ঞা) যা মানুষকে তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশ কীভাবে ঘটে তা বুঝতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আশুবেল (Ausubel), পিঁয়াজে (Piaget), গ্যানে (Gagne), ব্রুনার (Bruner) প্রমুখ।

7. **মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্ব (Humanistic Psychology) :** মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্বে সমগ্র মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর পথিকৃৎ হলেন কার্ল রজার্স (Carl Rogers)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করা হয় মানুষের আচরণ তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং স্ব-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। মানুষের দুঃখ, বেদনা, যত্ন এবং স্ব-মূল্যের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি আস্থাশীল। ম্যাসলো (Maslow) যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক তাঁর মতে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার চাহিদার দ্বারা, এই চাহিদাগুলি উচ্চ ক্রমপর্যায়ভুক্ত। যার নীচের দিকে আছে জৈবিক চাহিদাগুলি। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন চাহিদা এবং উচ্চ পর্যায়ে আছে ব্যক্তিগত চাহিদা যেমন—আত্মসম্মান, আত্মপূর্ণতা ইত্যাদি।

১.৪ মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Psychology)

বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে দিয়ে মনোবিদ্যা একটি স্বতন্ত্রতার জায়গায় উপনীত হয়েছে এবং বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন মনোবিদ এই নিয়ে মতভেদ প্রমাণ করেছেন। এই মতভেদ প্রসঙ্গে এল. এন. মান (Munn) বলেছেন— 'মনোবিজ্ঞান হল বিজ্ঞান এবং যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত মনোবিদ একজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পদ্ধতির অনুশীলনকারী। Psychology হল বৈজ্ঞানিক চর্চা ও তার বাস্তবিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রয়োগ। যেমন—আবেগ, অনুভূতি, আচরণ, জ্ঞান, যা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই তার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

1. **বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (Descriptive Science) :** মনোবিজ্ঞান হল বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন হয় তারই বর্ণনা করে।

2. **কার্যকারণ সম্পর্ক (Cause-effect relation) :** মনোবিদ্যা বিভিন্ন দিকের কার্যকারণ সম্পর্কে অনুধাবন করে। তাই এটি কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী।

3. **ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Practical Science) :** বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের সাথে সাথে এটি একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। কারণ, পদার্থবিদ্যা, গণিত বা রসায়ন এর মতো বিজ্ঞান হলেও এটি প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে বলে একে ব্যবহারিক বিজ্ঞানও বলা হয়।

4. **সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও তথ্য (Coherent knowledge and information) :** অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো মনোবিদ্যার সুসংবদ্ধ জ্ঞান, তথ্য, নীতি ও তত্ত্ব রয়েছে যেগুলি নতুন তথ্য আবিষ্কার এর ফলে এবং নতুন নীতি প্রয়োগও তত্ত্বের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়।

5. **সত্যের অনুসন্ধান (Search for truth) :** মনোবিদ্যার একটি অন্যতম দিক হলো সত্যের অনুসন্ধান করে।

6. **ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক (Practical and pragmatic) :** যে কোনো বিজ্ঞানের সাধারণত দুটি দিক থাকে, একটি শুদ্ধ (Pure) ও একটি ফলিত (Applied)। মনোবিদ্যার এই দুটি দিকই বর্তমান।

7. **বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (Objective descriptive science) :** মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত নৈর্ব্যক্তিক নয়, বরং মনোবিদ্যাকে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনামূলক বিজ্ঞানও বলা যেতে পারে।

১.৫ মনোবিদ্যার পরিধি ও পদ্ধতি (Scope and Method of Psychology)

১.৫.১ মনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Psychology)

মনোবিজ্ঞানের কার্যকারীতা এবং প্রয়োগ এর ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে। এখানে আচরণ কার্যটির দ্বারা সবধরনের ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতা এবং আচরণের জ্ঞানমূলক (Cognitive), অনুভূতিমূলক (Affective), মনোসঞ্চালনমূলক (Phychomotor) ইত্যাদির দিকে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নিম্নে মনোবিদ্যার বিভিন্ন পরিধিগত দিকগুলি আলোচিত হল—

1. **বিকাশমূলক মনোবিদ্যা (Developmental Psychology) :** মনোবিদ্যার এই শাখায় মানুষ কীভাবে বেড়ে ওঠে জন্মের পর থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, বার্ধক্য ইত্যাদি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সামগ্রিক যে পরিবর্তনের ধারা সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে বিকাশমূলক মনোবিদ্যা, যা পরিধির অন্তর্গত।

2. **সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology) :** মানুষের সমাজ প্রকৃতি ও তার সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান জোগায় মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় তা Social Psychology বা সামাজিক মনোবিদ্যা নামে পরিচিত। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে? মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে কেন বাস করে: দলবদ্ধভাবে থাকার মানসিকতার কারণ কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে সামাজিক মনোবিদ্যা।

3. **পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) :** মনোবিদ্যার এই শাখাটি সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ, শিখন, চিন্তন ইত্যাদি বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা অধ্যয়ন করে থাকে। মূলত এটি ল্যাবরেটরি ভিত্তিক, যেখানে মূলত পায়রা, কুকুর ইত্যাদি পরীক্ষামূলক বিষয় হিসেবে অধ্যায়ন করে থাকে।

4. **শারীরতাত্ত্বিক মনোবিদ্যা (Physiological Psychology) :** দৈহিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তা শারীরতাত্ত্বিক মনোবিদ্যা নামে পরিচিত। ইন্দ্রিয়, পেশী, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র হল শারীরতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

5. **শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology) :** মনোবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা। শিক্ষা মনোবিদ্যা হল একটি মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক শাখা যেখানে বিশেষ করে শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

6. **অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) :** অস্বাভাবিক বা অসুস্থ মনকে অনুশীলন করার জন্য মনোবিজ্ঞানের যে শাখাটি রয়েছে তা অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান নামে পরিচিত। মানসিক অসুস্থতা পর্যবেক্ষণ করা, তার কারণ খুঁজে বের করা, তার জন্য চিকিৎসাবিদ্যার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা, মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনের সহায়তা করাই হলো এই মনোবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু।

7. **শিল্পতত্ত্বমূলক মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) :** শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার লোক তাদের ভিন্ন ভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিল্পকেন্দ্র সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা হয় তাকে শিল্পতত্ত্বমূলক মনোবিদ্যা বলে।

8. **শিশু মনোবিদ্যা (Child Psychology) :** শিশু মনোবিদ্যা হল মনোবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে শিশুদের আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

9. **পরামর্শগত মনোবিদ্যা (Counselling Psychology) :** মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সমাজগত, শিক্ষাগত এবং পেশাগত সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অভ্যাস ও শিক্ষার্থীর উপযুক্ত চাকরির জন্য তাকে পরামর্শ দান করে থাকে।

10. **পরিবেশগত মনোবিদ্যা (Environmental Psychology) :** বাহ্যিক জগৎ তথা শব্দদূষণ, পরিবেশগত ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করাই পরিবেশগত মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

১.৫.২ মনোবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Psychology)

মনোবিজ্ঞানে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার হয়, তা নিম্নে আলোচিত হলো—

1. **অন্তর্দর্শন পদ্ধতি (Introspection Method) :** অন্তর্দর্শন হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি যা প্রথমে দর্শনের উপর ও পরে মনস্তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে ব্যক্তি তার চেতন মনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করে। অন্তর্দর্শনের অর্থ হল নিজের ভেতরকে জানা অর্থাৎ মানসিক অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করা। গঠনবাদী মনস্তত্ত্ববিদগণ (Structuralist) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। ব্যক্তির নিজের চেতন মনকে অধ্যয়ন করাই হল অন্তর্দর্শন। নিজের মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন—চিন্তা, অনুভূতি, প্রেষণা, কল্পনা ইত্যাদি জানার প্রক্রিয়া হল অন্তর্দর্শন। মনোবিদ উন্ড (Wundt) প্রথম অন্তর্দর্শন (Introspection) পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কোনো ব্যক্তিকে বলা হল—"বরফের ঠান্ডা জলে আঙুল চুবিয়ে তোমার কী অনুভূতি হয়, কী অভিজ্ঞতা হয় তা ব্যক্ত করো।" ব্যক্তি যেভাবে তার অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করে তাই হল অন্তর্দর্শন।

2. **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) :** আক্ষরিক অর্থে পর্যক্ষেণ হল বাইরে থেকে দেখা। প্রায় সমস্ত রকমের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পদ্ধতি। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করে ব্যক্তির অভ্যন্তরে যে মানসিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল তা অধ্যয়ন করাই হল এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ বাহ্যিক আচরণের মদ্য দিয়ে ঘটে বলে মনে হয়। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার সংকেত বহন করে। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চার করে। শিশুর বিকাশ সম্পর্কীয় বহু গবেষণা বিকাশের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছে যা শিশু মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পর্যবেক্ষণকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যেমন—স্বাভাবিক-কৃত্রিম, সংগঠিত-অসংগঠিত, অংশগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণকারী নয়, ইত্যাদি।

3. **সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) :** সাক্ষাৎকার হল একটি পদ্ধতি যেখানে সাক্ষাৎকারক কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কীয় নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে, তার মূল্যায়ন করে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নানারকমের হতে পারে, যেমন— চাকুরীর জন্য সাক্ষাৎকার, মনোচিকিৎসার জন্য সাক্ষাৎকার, পরামর্শদানের জন্য সাক্ষাৎকার। অনেক সাক্ষাৎকারে মৌখিক সাক্ষাৎকারককে

মৌখিক প্রশ্নাবলি বলেন। এটা সঠিক নয়, কারণ প্রশ্নাবলি হল অ-প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আর সাক্ষাৎকার হল সামনা-সামনি বসে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি। সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারী প্রয়োজনীয় তথ্য সামনা-সামনি বসে ব্যক্ত করে। সাধারণত ব্যক্তি লেখার থেকে বলতে পছন্দ করে। একজন দক্ষ সাক্ষাৎকারের নিকট তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে সু-সম্পর্ক বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এমন সব গোপন তথ্য জানতে পারে যা সাক্ষাৎকারীর পক্ষে লিখিতভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকার হল একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া যা তথ্য ও ভাবধারার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে। এর জন্য প্রয়োজন হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নৈকটত্ব এবং কথাবার্তার সমস্ত রকম পথ উন্মুক্ত রাখা। সাক্ষাৎকার হল একটি কৌশল যা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কার্যধারার প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারকে বিভক্ত করা যায়। সাক্ষাৎকারের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হল—

ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার (Individual and Group Interview) : সাক্ষাৎকার যখন একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলে এবং যখন একদল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন তাকে দলগত সাক্ষাৎকার বলে।

সংগঠিত ও অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Structured and Unstructured Interview) : সংগঠিত সাক্ষাৎকার পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একই প্রশ্ন এখানে একইভাবে উপস্থাপিত হয়। বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা খুব সীমিত এবং তা পূর্ব-পরিকল্পিত।

অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার নমনীয় হয়। সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের স্বাধীনতা বেশি থাকে এবং সাক্ষাৎকারীর উত্তরের বাধাও কম থাকে। প্রশ্নগুলি পূর্ব পরিকল্পিত হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশ্নের পরিবর্তনের অবকাশ থাকে।

অনির্দেশিত এবং কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার (Non-directed and Focused Interview) : অ-নির্দেশিত সাক্ষাৎকার (মনোবিশ্লেষণ যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য) অভ্যন্তরীণ প্রেষণা, অন্তর্নিহিত প্রতিন্যাস, ব্যক্তিগত আশা, ভয়, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বারা পরিচালিত সাক্ষাৎকার হল কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার।

আদর্শায়িত ও অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকার (Standardised and Non-standardised Interview): আদর্শায়িত এবং সংগঠিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলি পদ্ধতির মিল আছে। নির্দিষ্ট পরিবেশে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে এই

সাক্ষাৎকার পরিচালিত হবে। অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকারের সঙ্গে অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রশ্নগুলি অনেক সময় পূর্ব-পরিকল্পিত হলেও সাক্ষাৎকারীর গভীরে প্রবেশ করার জন্য সাক্ষাৎকারককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

4. **ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি (Clinical Method) :** প্রধানত অপসংগতিমূলক এবং স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুত আচরণ সম্পর্কিত বিশদ তথ্যসংগ্রহের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অপসংগতিমূলক আচরণ নানা প্রকৃতির হতে পারে যেমন— অসামাজিক আচরণ, প্রক্ষোভমূলক সমস্যা, শিখন সমস্যা, বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ে পিছিয়ে পড়া, ইত্যাদি।

ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিত করা, কারণ নির্ণয় করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সঠিক অভিযোজনের জন্য চিকিৎসার সুপারিশ করা। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অবচেতন মনে প্রবেশ করে অসংগতিপূর্ণ আচরণ নির্দিষ্ট করা ও তার সংশোধন করা। চিকিৎসক সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার্থীর অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা, গৃহে বিদ্যালয়ে এবং সমাজে শিক্ষার্থীর অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমস্ত উৎস থেকে তথ্যসংগ্রহ করে তাকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীর 'কেস হিস্ট্রি' তৈরি করা এবং অস্বাভাবিকতার কারণ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসকগণ সাধারণত দু-ভাবে 'কেস স্টাডি' করে থাকে। (1) ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডি এবং (2) বিকাশমূলক কেস স্টাডি।

ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডি প্রস্তুতে নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়—

ক) **প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) :** নাম, বয়স, লিঙ্গ, পিতা-মাতার বয়স, শিক্ষা, বৃত্তি, আয়, সন্তান সংখ্যা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি।

খ) **অতীত ইতিহাস (Previous History) :** গর্ভকালীন মাতার অবস্থা (কোনো সমস্যা ছিল কিনা), জন্মাবার পর শিশুর বিকাশ, শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, অসুস্থতার, পিতামাতার এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ইত্যাদি।

গ) **বর্তমান অবস্থা (Present Conditions) :** নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক আগ্রহ, বিদ্যালয়ে পারদর্শিতা ইত্যাদি।

5. **সার্ভে পদ্ধতি (Survey Method) :** শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমীক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানমূলক সার্ভে পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। এখানে Sampling বা দল বাছাইকরণ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন—অভীক্ষা, প্রশ্নগুচ্ছ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সার্ভে পদ্ধতির তিনটি শ্রেণি আছে—

a) **ফিল্ড স্টাডি (Field Study) :** এখানে ঘটনা যেখানে ঘটে সেখানে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে আচরণ পরিচালিত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ পরিকল্পিত শিখন উপকরণ প্রস্তুত করতে হয়। যাদের জন্য পরিকল্পিত উপকরণ প্রস্তুত করা হবে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে প্রথমে পরীক্ষা করা হয়। এইভাবে পরীক্ষা করে চূড়ান্ত যথার্থতা নির্ণয় করার পর প্রকৃত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয়। একেই Field try out বলে।

b) **বিকাশমূলক সার্ভে (Developmental Survey) :** বিকাশমূলক সার্ভে ক্লিনিক্যাল সার্ভের ন্যায়। এই ধরনের সার্ভেও উলম্ব (Longitudinal) ও অনুভূমিক (Cross-sectional) হতে পারে।

c) **পার্থক্যমূলক সার্ভে (Differential Survey) :** এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ দেশের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণ।

6. বিজ্ঞানভিত্তিক বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Experimental Method) : মানুষের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার জন্য মনস্তত্ত্ববিদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। আচরণবাদীদের একটি বড়ো অবদান হল পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের আচরণ বোঝা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার সঙ্গে অধ্যয়ন করার জন্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। যেমন প্রাণী কীভাবে শেখে, কীভাবে সেই শিখন অন্য কোনো বিষয়ে শিখতে সাহায্য করে ইত্যাদি।

অনেক মনোস্তাত্ত্বিগণের মতে পরীক্ষা হল নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, উপাদানের বৈচিত্র্য, সঠিকভাবে সংখ্যার মাধ্যমে ব্যক্ত করা এবং প্রকল্পগুলিকে (হাইপোথিসিস) কঠোরভাবে বিচার করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণই একমাত্র উপায়। পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি যে ধারাবাহিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে পরীক্ষণমূলক নকশা (Experimental Design) বলে। পরীক্ষণমূলক নকশা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটিতে নিম্নে উল্লিখিত ৬টি স্তর আছে। যেমন—

গবেষণার সমস্যা নির্দিষ্টকরণ (Identification of Research Problem)

↓

হাইপোথিসিস গঠন (Formulation of Hypothesis)

↓

সঠিক নকশা নির্বাচন (Selection of Research Design)

↓

পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ (Data collection through experiment)

↓

প্রাপ্ত ফলকে বিশ্লেষণ (Analysis of Data)

↓

আলোচনা এবং মন্তব্যকরণ (Discussion and Commenting)

পরীক্ষণমূলক নকশার দ্বিতীয় অর্থটি আরও নিয়ন্ত্রিত। এটি হল একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের (subjects) পরীক্ষণমূলক শর্তের মধ্যে রাখা এবং সঠিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা। পরীক্ষণমূলক নকশা গবেষককে নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। পরীক্ষণমূলক নকশার সঠিকতার উপর গবেষণার মান নির্ভর করে। গবেষক কী ধরনের সমস্যার উপর কাজ করবেন তার উপর নির্ভর করে পরীক্ষণমূলক নকশার রূপরেখা। পাঠকদের বুঝতে হবে কোনো একটি নকশা সব সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে যা ল্যাবোরেটরিতে বা পরীক্ষাগারে করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষকেই নির্দিষ্ট করতে হবে। সম্প্রতিকালে গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষণমূলক নকশার কথা উল্লেখ করেছেন। পাঠককে পরীক্ষণমূলক নকশার মূল কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত করার জন্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা এবং কয়েকটি পরীক্ষণমূলক নকশার উল্লেখ করা হল।

i) পরীক্ষাগারের পরীক্ষা (Laboratory Experiment) : কোনো কোনো সমস্যাকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব, যেমন— থর্নডাইকের বেড়াল পরীক্ষা, এবিংহসের স্মৃতির উপর পরীক্ষা ইত্যাদি।

ii) পরীক্ষাগারের বাইরে পরীক্ষণমূলক নকশা (Experimental Design outside the Laboratory) : পরীক্ষণমূলক নকশাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি এবং আংশিক নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। পরীক্ষায় কত জন অংশগ্রহণ করছে, কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে পরীক্ষার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা। কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং গবেষক কী প্রকার সমস্যার উত্তর দিতে চলেছেন তার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল দলের সংখ্যার উপর। দলের সংখ্যা এক হতে পারে, দুই হতে পারে আবার অসংখ্য হতেও পারে। যেমন— এক দলীয় নকশা, দুই দলীয় নকশা ইত্যাদি।

১.৬ সারাংশ (Summary)

মনোবিজ্ঞান মূলত মানুষের আচরণের অধ্যয়নমূলক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে অধ্যয়নের মূল বিষয় হল

মানুষের আচরণকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। আধুনিক সময়ে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কমূলক বিষয় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা মনোবিদ্যা, সামাজিক মনোবিদ্যা, জ্ঞানমূলক মনোবিদ্যায়। এই অধ্যয়নের শুরুতেই আলোচিত হয়েছে মনোবিদ্যার ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি এর সম্পর্কে।

স্বাভাবিকভাবে মনোবিজ্ঞান কথাটি শুনলেই মনে হয় এটি মনের বিজ্ঞান। এটা কতটা ঠিক বা বেঠিক তা আমরা আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করবো।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে আমরা বলতে পারি মনোবিদ্যা হল বিজ্ঞানের একটি শাখা যা মানুষের আচরণ, বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুশীলন করে।

এই অধ্যায়ে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি, পরিধি এবং মনোবিজ্ঞানের ধারণা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. মনোবিদ্যা বলতে কি বোঝেন?

২. মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিন।

৩. মনোবিদ্যার দুটি পরিধি লিখুন।

৪. মনোবিদ্যার দুটি প্রকৃতি লিখুন।

৫. মনোবিদ্যার জ্ঞান আহরণে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কি?

৬. একজন শিক্ষকের মনোবিজ্ঞানের ধারণা থাকা আবশ্যক কিনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যক্ত করুন।

৭. মনোবিজ্ঞানে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি বলুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ২ ❑ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে মনোবিদ্যা
(Psychology as the Foundation of Education)

গঠন (Structure)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ ভূমিকা (Introduction)

২.৩ শিক্ষা মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Educational Psychology)

২.৪ শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক (Relation between Education and Psychology)

২.৫ শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব (Impact of Psychology on Education)

২.৬ সারাংশ (Summary)

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Question)

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা আশা করা হচ্ছে যা শিখবে—

- মনোবিদ্যার ধারণা এবং শিক্ষার সাথে মনোবিদ্যার সম্পর্ক
- শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান উপলব্ধি করা
- শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অর্থ উপলব্ধি করা
- শিক্ষা-ধারণা প্রাপ্ত হওয়া
- শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা
- শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে।

২.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Education। শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করে। বর্তমানে শিক্ষা একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে চারটি বিষয়গত

ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যা হল— শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical basis of Education), শিক্ষার সমাজভিত্তিক ভিত্তি (Sociological basis of Education), শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological basis of Education), শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical basis of Education)। আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিদ্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের নীতির উপর ভিত্তি করা হয়। মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে শিশুকে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে পারলে তার সামগ্রিক মানসিক বিকাশ ঘটে। মনোবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা হয়। আধুনিক শিক্ষায় মুক্ত শৃঙ্খলা মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২.৩ শিক্ষামনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Educational Psychology)

‘শিক্ষা’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘শাস’ ধাতু থেকে। যার অর্থ হল শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, নির্দেশনা দেওয়া। শিক্ষাকে ‘বিদ্যা’ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এই ‘বিদ্যা’ কথাটি এসেছে ‘বিদ’ ধাতু থেকে। যার অর্থ হল জ্ঞান। ‘শাস্’ বা ‘বিদ্যা’ উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের একটা সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Education’। ‘Education’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন অর্থের সন্ধান করেছেন। ইংরেজি ‘Education’ শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ ‘Educare’ থেকে, যার ব্যাপক অর্থ হল পরিচর্যা করা বা শিক্ষার্থীকে জীবনোপযোগী কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। আবার কেউ কেউ বলেন, ‘Education’ শব্দটি এসেছে মূল লাতিন শব্দ ‘Educere’ থেকে। যার অর্থ অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সামর্থ্য নিষ্কাশনে সহায়তা করা। অন্য একটি মতবাদ অনুযায়ী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে যার মূলগত অর্থ হলো শিক্ষাদানের কাজ।

মনোবিদ্যার সম্পর্কে ধারণা আমরা পূর্বে অধ্যয়ন করেছি। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি ফলিত শাখা, যেখানে মূলত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। এবার আমরা আলোচনা করব শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক—

২.৪ শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক (Relationship Between Education and Psychology)

ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ বা সামগ্রিক আচরণ অনুশীলন করা হয় মনোবিজ্ঞানে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা হয় শিক্ষাবিজ্ঞানে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন ব্যক্তি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু তেমনি ব্যক্তি। এই হিসেবে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান। যে ব্যক্তির আচরণ অনুশীলন করা হচ্ছে, তাকেই শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করে তোলা হচ্ছে। সুতরাং এই

দুই বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়বস্তু সাদৃশ্য আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা সম্পর্কযুক্ত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক সর্বজনস্বীকৃত। তবে, শুধু শিক্ষা-মনোবিদ্যা নয়, সাধারণভাবে মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখাও শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক শিক্ষার দুটি দিক আছে— একটি হল তার তাত্ত্বিক দিক অপরটি হল ব্যবহারিক দিক। মনোবিজ্ঞান তার এই উভয় দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক শিক্ষার সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বই মনোবিজ্ঞানের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন— আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের (Aim of education) কথা ধরা যাক। এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য। পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক উভয় দিকের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। আর এই বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। অন্যদিকে আমরা জানি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও মানুষের সামগ্রিক অভিযোজনমূলক আচরণের গতিপ্রকৃতি অনুশীলন করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিদ্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার জন্য শিশুদের আচরণগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেন এবং মনোবিজ্ঞানের সকল শাখাগুলির সাহায্য নিয়ে থাকেন। মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষার এই নির্ভরতা তার প্রায়োগিক স্বার্থেই বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয় শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের কাজ এক। শিক্ষার সমস্ত স্তরে মনোবিজ্ঞান পৌঁছোতে পারে না। যেমন শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই, তবে শিক্ষা-দার্শনিকগণ যেভাবে লক্ষ্য স্থাপন করবেন সে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায়মাত্র মনোবিজ্ঞান ইঙ্গিত দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ রায়বার্ন (Ryburn)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মনোবিজ্ঞান আমাদের চালক নয়, বরং তাকে আমাদের আজ্ঞাবহ বলা যেতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তার কোনো ক্ষমতা নেই। সে কাজ নীতিবিজ্ঞান বা দর্শন করে থাকে।"

২.৫ শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব (Impact of Psychology on Education)

1. **শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান (Aims of Education and Psychology) :** মনোবিজ্ঞান মানুষের মন বা আচরণ অনুশীলন করে তার সাধারণ নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক বিকাশসাধনের জন্য মনোবিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিমনের বিকাশসাধন করা যা মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান।

2. **আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (Modern Child-centric Education and Psychology) :** আধুনিক শিক্ষার মূল কথা হল—শিশুর জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়। আধুনিক এই শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child-centric Education)। এই শিক্ষার তাৎপর্য হল— শিক্ষার্থীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ প্রবণতা ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে জানতে হবে। শিক্ষার্থীকে ভালো করে জানার অর্থ হল তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন করা। একমাত্র মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানই পারে কোনো মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুশীলন করতে। এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের শাখা শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। সুতরাং, শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

3. **আধুনিক শিক্ষালয়ের ধারণা ও মনোবিদ্যা (Concept of Modern Educational Institutions and Psychology) :** মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, শিশুর আচরণ পরিবর্তনের জন্য স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক শিক্ষার শিক্ষালয় সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিক্ষালয় এমন হবে যেন তা সামাজিক পরিবেশে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে পারে। শিক্ষালয় সংক্রান্ত এই ধারণা সামাজিক মনোবিদ্যার (Social Psychology) ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

4. **সক্রিয়তার নীতি ও মনোবিদ্যা (Principle of Activity and Psychology) :** মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়তাপ্রবণ। অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি শিশুই চঞ্চল প্রকৃতির, যে কিছু না কিছু করতে চায়। তার এই কিছু করার মধ্যেই সে শিক্ষা তথা অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিশুর এই সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার আচরণগত প্রবণতাগুলির পরিবর্তন ঘটে। সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারলে শিশুর কাছে শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষার একটি মূল নীতি হল সক্রিয়তার নীতি (Activity Principle)। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমেই শিখবে। আধুনিক শিক্ষার এই সক্রিয়তার নীতি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

5. **শিক্ষণ পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান (Methods of Teaching and Psychology) :** আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির প্রত্যেকটিই মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি হল—

   - জ্ঞানের সামগ্রীকে বহু ইন্দ্রিয়ভিত্তিক উদ্দীপনার (Multisensory stimulation) মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশকে নির্দিষ্ট ধারাবাহিক (Serial Order) অনুযায়ী উপস্থাপন করা।
- পাঠ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী কর্ম নির্বাচন করা।

6. **পাঠক্রম রচনা ও মনোবিজ্ঞান (Curriculum Construction and Psychology) :** মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, শিশুকে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে পারলে তার সামগ্রিক মানসিক বিকাশ ঘটে। মনোবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা হয় এবং পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের উপযোগী প্রয়োজনীয় সকল রকম অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে সেটিকে বহুমুখী করে তোলা হয়।

7. **সময় তালিকা ও মনোবিজ্ঞান (Time Table and Psychology) :** কাজ ও অবসাদ (Work and Fatigue) সংক্রান্ত মূল মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সময়তালিকা স্থির করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়গুলি দিনের প্রথম অংশে অথবা বিরতির ঠিক পরেই রাখা হয়। একটানা অনেকক্ষণ সময়ের জন্য বিরতি না দিয়ে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য বিরতি দেওয়া হয়।

8. **শৃঙ্খলা ও মনোবিদ্যা (Discipline and Psychology) :** মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, আত্মশৃঙ্খলা স্থাপিত হলে, তার মাধ্যমে যে আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যক্তির মধ্যে থাকে। অন্যদিকে, বহির্জাত শৃঙ্খলার মাধ্যমে যে আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। অনুশাসন বা চাপের অভাব ঘটলে, সেই আচরণগুলি আবার ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের যে মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

9. **ব্যক্তিগত বৈষম্য ও মনোবিজ্ঞান (Individual Difference and Psychology) :** প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষেভিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে হতে পারে। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা হয়।

২.৬ সারাংশ (Summary)

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "Education is the manifestation of perfection already in man"। অর্থাৎ শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষের সার্বিক

বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন হয়। এই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। অন্যদিকে মনোবিদ্যা বলতে আমরা বুঝি সেই বিদ্যা যা মানুষের আচরণকে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ করে ও সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌছায়। আমরা শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক বুঝতে পারি। শিক্ষা হল মানুষের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, মনোবিদ্যা হল মানুষের আচরণের বিদ্যা। দুটি ধারণার মুখ্য বিষয় হল আচরণ। আমরা এই অধ্যায়ে শিক্ষা ও মনোবিদ্যার কি সম্পর্ক তা জেনেছি। শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাবগুলি আমরা এই অধ্যায়ে জেনেছি।

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক কি?

২. শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি কি কি?

৩. শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য লিখুন।

৪. শিক্ষণ পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান এর প্রভাব, আলোচনা করুন।

৫. শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাবগুলির দিক নির্দেশ করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. s. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ৩ ❑ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা, প্রকৃতি এবং গুরুত্ব (Concept, Nature and Significance of Educational Psychology)

গঠন **(Structure)**

৩.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৩.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৩.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা **(Concept of Educational Psychology)**

৩.৪ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার প্রকৃতি **(Nature of Educational Psychology)**

৩.৫ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার তাৎপর্য **(Significance of Educational Psychology)**

৩.৬ সারাংশ **(Summary)**

৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধি করবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য কি তা উপলব্ধি করতে পারবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্যগুলির সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি কি তা উপলব্ধি করতে পারবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে পারবে।

৩.২ ভূমিকা (Introduction)

সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যক্তির আচরণ আয়ত্তীকরণ এবং সংশোধন। মনোবিজ্ঞান জীবিত প্রাণীর আচরণ বর্ণনা করে ও ব্যাখ্যা করে। আধুনিক মনোবিদ্যার ক্ষেত্র বহুল বিস্তৃত। মনোবিজ্ঞানের

সুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের যে অংশ মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করা হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে। মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিখনের যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে তার সমাধান এবং ব্যাখ্যা করাও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজের অন্তর্ভুক্ত, আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যার সাহায্যে শিক্ষকেরা তাদের পেশাগত এবং সমাজগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে।

৩.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Educational Psychology)

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্যতম শাখা হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা যা শিক্ষার্থীর শিখন পরিবেশ সম্পর্কে অনুসরণ করে। সুতরাং বলা যায় মনোবিজ্ঞানীর বিভিন্ন তথ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিক হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা। যেখানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি তথ্যসূত্র তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং শিখন পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং তার ব্যাখ্যা করা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

মনোবিজ্ঞানের সুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের যে অংশে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করা হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে থাকে। এটি একটি ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা ও তার যথাযোগ্য তাৎপর্য নির্ণয় করা। কিন্তু এই আচরণ সামগ্রিক আচরণ নয়, বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হল শিক্ষা পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরণ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

সংজ্ঞা (Definitions) : মনোবিদ স্কিনার (Skinner)-এর মতে—"Education Psychology is the branch of psychology which deals with teaching-learning and also covers the entire range and behaviour of the personality as related to education."

মনোবিদ বার্নার্ড (Bernard) বলেছেন— "Education Psychology is one of the major divisions of the broad study, deals with learning and teaching specially in the schools, which are society's formal institution of facilitating learning."

মনোবিদ ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) বলেছেন— "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হ'ল ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা"।

জাড্ (Judd) বলেছেন—"শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তিজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরের যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনাও ব্যাখ্যা করে"।

মনোবিদ পিল (Peel)-এর মতে,— “Educational Psychology is the Science of Education.”

সুতরাং, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিকই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। তবে মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কাজ নয়, মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিখনের যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে তার সমাধান এবং ব্যাখ্যা করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৪ শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology)

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সাধারণ মনোবিজ্ঞান এর মত স্বতন্ত্র নয়, যা মূলত মনোবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলির বিষয় নির্ভর তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। মনোবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হল—

(a) **শিক্ষা মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা (Educational psychology is a separate branch of psychology) :** পূর্বে শিক্ষা মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা হিসেবে বিবেচিত হত। বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত। কোন জ্ঞান ভাণ্ডারকে পৃথক বিষয় বলে স্বীকৃতি পেতে হলে কতগুলি শর্ত পালন করতে হয়, এই শর্তগুলির দ্বারা জ্ঞান বিষয়টিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করতে পারবে, এর নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি ও সমস্যা থাকবে যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে সমাধানের উপায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব। সমাধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকবে, যেখানে শিক্ষা মনোবিদ্যা সব শর্ত পূরণ করে।

(b) **শিক্ষা মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি (Educational psychology has its own method):** শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়ে অনুশীলনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল পরীক্ষণ পদ্ধতি, জেনেটিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দর্শন পদ্ধতি, কেস স্টাডি, তুলনামূলক পদ্ধতি।

(c) **শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Educational psychology is an ideal science):** ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল হয় এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে। ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হোক এমন কোন বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে না। এই বিষয়টি মূলত সমাজের মঙ্গলকর এবং শিক্ষার্থীর কল্যাণকর বিষয় নিয়ে সব সময় আলোচনা করে।

(d) **শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি গতিশীল বিষয় (Educational psychology is a dynamic subject):** শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের যেমন— শিক্ষণ, শিখন, প্রেষণা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদিরও ওপর ব্যাপক গবেষণা করা হয় এবং তার ওপর ভিত্তি করে নতুন তথ্য নীতি ও সূত্র আবিষ্কার হচ্ছে। যার প্রয়োগ শিক্ষা বিজ্ঞানকে আরো উন্নততর ও কার্যকর করে তুলছে। এই অর্থে শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি গতিশীল বিষয়।

(e) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) :** শিক্ষা মনোবিদ্যা ব্যক্তি পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই ব্যক্তি পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা মনোবিদ্যা তার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে।

(f) **শিক্ষা মনোবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞান (Educational psychology and other science):** শিক্ষা মনোবিদ্যার শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, পরিসংখ্যান, শারীরবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করে শিক্ষা মনোবিদ্যাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করে।

(g) **শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ এবং তার পূর্বাভাস (Control and predictive analysis of student learning behaviour):** শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিকল্পনাও করে থাকে।

৩.৫ শিক্ষামনোবিদ্যার তাৎপর্য (Significance of Educational Psychology):

ভূমিকা (Introduction) : শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জ্ঞানের এই শাখার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। সাধারণত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সব থেকে বেশি দায়িত্বভার অর্পণ করে থাকে শিক্ষকের উপর। বিশেষত তাঁর পেশাগত সাফল্যের উপর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্য তাঁর পেশাগত জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং একইসঙ্গে পেশাগত মনোভাব গঠন করা দরকার। পেশাগত জ্ঞান কর্মপরিবেশে শিক্ষককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করবে, আর পেশাগত দক্ষতার জন্য তাঁর কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে পেশাগত মনোভাব নিজের পেশা সম্পর্কে উপযুক্ত মানসিকতা গঠনে তাঁকে সাহায্য করবে। বস্তুতপক্ষে এই তিনটি দিক সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন করতে পারলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। এইজন্য শিক্ষামনোবিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞান একজন শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অপরিহার্য। নিম্নে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল।

১) প্রাথমিক উপাদান ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Primary Element and Educational

Psychology): শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণগত পরিবর্তন আনা। তবেই সে সার্থকভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সক্ষম হবে। এইজন্য তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বৃদ্ধি করা দরকার। তবে তা নির্ভর করে তার জন্মগত-সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য ও প্রবণতার উপর। বিশেষভাবে তার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, মেজাজ, বুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলি সে জন্মগত-সূত্রে লাভ করেছে সেইগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে না পারলে সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা অকেজো হয়ে পড়বে। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, সামর্থ্য, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২) **আচরণের পরিবর্তন ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Behavioural Change and Educational Psychology) :** শিশু জন্মগত-সূত্রে যে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আসে সেগুলি চিরকাল একই রকম অবস্থায় থাকে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে সেইগুলির পরিবর্তন হয়। এই সমস্ত পরিবর্তিত ক্ষমতা পরিবর্তনশীল পরিবেশে তাকে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতি হিসাবে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং চরিত্র গঠিত হয়। শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার পরিবর্তনের দিকগুলি লক্ষ রাখতে হলে সেই পরিবর্তনের ধারা অনুশীলন করতে হবে। এইক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যা আমাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা দান করে থাকে। তাই শিশুর আচরণ পরিবর্তনের ধারা অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার যথেষ্ট অবদান থাকায় তার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

৩) **শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Child-Centric Education and Educational Psychology) :** গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। তিনিই শিক্ষাদান কার্যের মধ্যমণি ছিলেন, আর শিশু নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসাবে অবস্থান করত। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদা স্বীকৃতি পাওয়ায় পরবর্তীকালে শিক্ষা তার গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে শিশুকেন্দ্রিকতার রূপ নেয়। এইরূপ শিক্ষায় শিশুই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তবে শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করতে হলে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন্ কোন্ দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, কী ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে অথবা কী কী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য।

৪) **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আচরণ ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Students behaviour in the Classroom and Educational Psychology) :** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল সম্পর্কের জাল ছড়িয়ে থাকে। এরই উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে উপদল গঠন করে। উপদলগুলির উপর শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কখনও এই দলগুলি শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকালে পরস্পরের সহযোগী হয়ে ওঠে, আবার কখনও শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশকে

নষ্ট করে দিয়ে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান করে। শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের দলীয় গতিধর্মীতা (Group Dynamics) সম্বন্ধে শিক্ষককে আবশ্যিকভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কারণ শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া শিখন প্রক্রিয়া কখনোই রূপ পেতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীদের দলীয় মনের (Group Mind) প্রকৃতি সম্পর্কে অনুশীলন করতে হলে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অপরিহার্য।

৫) **শিশুর প্রকৃতি ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Child Nature and Educational Psychology) :** শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য পেতে হলে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তার সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অ্যাডমস (Adams)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— “The teacher teaches John Latin” অর্থাৎ শিক্ষক জন (John)-কে ল্যাটিন শিক্ষা দেন। এই বাক্যে দুটি কর্ম—John এবং Latin। বাক্যটির তাৎপর্যগত দিক হল এই যে, শিক্ষকের ল্যাটিন অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি জন (John)-এর প্রকৃতি সম্বন্ধেও ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। আর জন (John)-কে জানার অর্থ হল জন (John)-এর মানসিক সংগঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা গঠন। এই জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে পারে শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই শিশুর প্রকৃতি অনুশীলনে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে।

৬) **শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Teaching Method and Educational Psychology):** শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ভর করে সার্থক শিক্ষা পদ্ধতির উপর। উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষণ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। শিক্ষণ পদ্ধতি সঠিকভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হলে তবেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগ স্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থী স্বল্পতম প্রয়াসে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে। শিক্ষাকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে একদিকে যেমন সঠিক পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। পদ্ধতি নির্বাচন বা পদ্ধতি উদ্ভাবনের ভিত্তি হল শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই আমরা এইদিক থেকে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে পারি না।

৭) **বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Subject-matter Selection and Educational Psychology):** শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই শিক্ষার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করা দরকার। আবার যে সমস্ত বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হল সেইগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের অনুকূল কিনা তা যাচাই দরকার। সব শিশুই একই ধরনের দক্ষতা, আগ্রহ, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব পৃথক সত্তা থাকায় একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক শিশুর জন্য একই ধরনের

পাঠক্রম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ব্যক্তি-বৈষম্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিশুর জন্য কী ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে একমাত্র শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই শিক্ষামনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অপরিহার্য।

৩.৬ সারাংশ (Summary)

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্যতম শাখা হলো শিক্ষামনোবিদ্যা। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষা মনোবিদ্যার ধারণা, প্রকৃতি ও তার তাৎপর্য। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ধারণা দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ভবিষ্যতে কী হতে পারে তার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কাজ নয়, মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিখনের যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে তার সমাধান এবং ব্যাখ্যা করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো ও তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যেসব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন তাই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি। শিক্ষা-মনোবিদ্যার জ্ঞান একজন শিক্ষকের কাছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য, তার সাথে বর্তমান শিক্ষা তথা শিশুদের শিক্ষা জীবনে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. শিক্ষাগত মনোবিদ্যা কি?

২. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিন।

৩. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার দুটী প্রকৃতি লিখুন।

৪. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৫. বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য শিক্ষার্থীকে কিভাবে জানানো যায়—এক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা কি?

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

পর্যায়-২

বৃদ্ধি এবং বিকাশ

(Growth & Development)

একক ৪ ❑ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of a child)

গঠন (Structure)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

৪.৩ বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা (Concept of Growth and Development)

৪.৪ বিকাশের প্রকৃতি ও নীতি (Nature and Principles of Development)

৪.৫ বিকাশের বিভিন্ন দিক বা মাত্রা (Dimensions of Development)

৪.৬ সারাংশ (Summary)

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে—

- শিশুর বুদ্ধি সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে
- শিশুর বিকাশ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে
- বিকাশকে অর্থবহ করে তুলতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হবে
- বিকাশের নীতিগুলি কি তাহার ধারণা গড়ে উঠবে
- বৃদ্ধি ও বিকাশের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠবে
- বৃদ্ধির বৈশিষ্টগুলি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠবে

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

প্রতি মুহূর্তে শিশুর মধ্যে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে তাদের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনকেই বলা হয় বিকাশ (Development) এটি জীবনব্যাপী সামগ্রিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এই ভূমিকা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত এইসব গুণগত পরিবর্তনগুলির

মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি আবার বিশেষ নিয়মও মেনে চলে। তবে বিভিন্ন ধরনের বিকাশগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশুর জীবনের একদিকের বিকাশ যথাযথভাবে সংঘটিত না হলে অন্যান্য দিকের স্বাভাবিক বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে বিকাশ বলতে দৈহিক বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নয়নকে বোঝায় না। এটি এমন একটি জটিল, ধারাবাহিক ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক (physical), সামাজিক (social), প্রাক্ষোভিক (emotional), নৈতিক (moral), জ্ঞানমূলক (cognitive) ইত্যাদি দিকের পরিবর্তন সূচিত হয়।

তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। বৃদ্ধি বলতে শিশুর দেহের পরিমাণগত পরিবর্তন বোঝায়। বৃদ্ধির সাধারণ কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেইরূপ মনোবিজ্ঞানীরা মানব, বিকাশকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।

৪.৩ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা (Concept of Growth and Development of a Child)

জীবনে প্রতিমুহূর্তে, ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন— বৃদ্ধি (Growth), বিকাশ (Development), পরিণমন (Maturation) ইত্যাদি। তাই 'বিকাশ' বলতে আমরা কি বুঝি, তা প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। দুটো প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন (Change) আনতে সক্ষম। কিন্তু 'বৃদ্ধি' বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (Change in size and volume) বুঝি আর 'বিকাশ' (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (Change in shepe) এবং কাজের উন্নতিকে (Improved function) বোঝাতে চাই। 'বৃদ্ধি' (Growth) কথাটির দ্বারা আমরা মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব তাৎপর্যহীনভাবে (Casual) বোঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Development) কথাটি ব্যবহার করি, তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝাতে চাই। যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের কাঠামো লম্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বোঝাতে চাই। যখন বলি, শিশুদের দৈহিক বিকাশ হয়েছে, তখন শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বোঝাই না, সেগুলোর পরিবর্তন হওয়ার ফলে তার যে কর্মক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোঝাতে চাই। তা ছাড়া, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটি পার্থক্যের দিক হল— বৃদ্ধি (Growth) সাময়িক প্রক্রিয়া, কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Continued throughout life)। বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও বিকাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

বৃদ্ধি (Growth) : বৃদ্ধি বলতে মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর দেহের পরিমাণগত (Quantitative) পরিবর্তন

অর্থাৎ দেহের আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধিকে সূচিত করেছেন)। এই প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী Arnold Gessel বলেছেন— "Growth is a function of the organism rather than of the environment as such." অর্থাৎ বৃদ্ধি হল দেহযন্ত্রের ক্রিয়া যা পরিবেশের ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় না।

1. প্রাণীদেহের বৃদ্ধির যে বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় তা প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির নিজস্ব নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত।
2. প্রাণীদেহের বৃদ্ধির এই অভ্যন্তরীণ নিয়ামক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধির সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখে এবং দৈহিক বৃদ্ধিকে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করে।
3. দৈহিক বৃদ্ধির নিয়ামককেই এককথায় বলা হয় পরিণমন (Maturation), যার দ্বারা দেহের অস্থি, পেশি, শিরা-উপশিরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহকোশ ইত্যাদি পরিণত হয়।

বিকাশ (Development) : বিকাশ হল ব্যক্তির সেই জাতীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন যার দ্বারা ব্যক্তি যে-কোনো জাগতিক ক্রিয়াকলাপকে আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ বিকাশ হল বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন এবং কাজের উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে তখন সে দৌড়োতে পারে না; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব সহজেই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দৌড়োতে পারে। হাঁটতে পারাটা শিশুর বৃদ্ধির ফল কিন্তু দৌড়োবার ক্ষমতা অর্জন হল দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ।

8.8 বিকাশের প্রকৃতি ও নীতি (Nature and Principles of Development)

- বিকাশ হলো অন্তর্যন্ত্রীয় ক্রিয়াগত পরিবর্তন
- বিকাশ ব্যক্তি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট গুণগত পরিবর্তন
- বিকাশ হলো প্রকৃত ঘটনা যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।
- বিকাশ জ্ঞানমূলক-প্রাক্ষেভিক তন্ত্রের উপর নির্ভর করে।
- বিকাশ সারা জীবন ধরে চলতে থাকে।
- বিকাশের ফলে সাধিত পরিবর্তনগুলিকে সেভাবে পরিমাপ করা যায় না।
- বিকাশ হলো অপেক্ষাকৃত জটিল প্রক্রিয়া।

বিকাশের নীতি (Principles of Development) : বিকাশ যদিও একটি ব্যক্তিগত ঘটনা, ভ্রূণের নিষিক্তকরণের সময় থেকে শুরু করে আমৃত্যু সময়কাল ধরে এটি একটি যৌক্তিক ও পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি

সাধারণ নীতি বা নিয়ম মেনে চলে। এই নীতি বা নিয়মগুলিকে সাধারণত বিকাশের নীতি বলা হয়।

১. **ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of Continuity) :** ধারাবাহিকতার নীতি অনুযায়ী বিকাশ মানবজীবনের একটি নিরবিচ্ছিন্ন সীমাহীন পদ্ধতি। বিকাশ সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলি যতই সূক্ষ্ম ও ধীর গতিসম্পন্ন হোক না কেন, তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সকল ক্ষেত্রেই জীবনব্যাপী ঘটে চলে।

২. **বিকাশের হারে সমরূপতার অভাবের নীতি (Principles of Lack of Uniformity in the developmental rate) :** বিকাশ জীবনের বিকাশকালীন সময়ে বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সমতা ও সংগতির নিয়ম মেনে ঘটে না। বিকাশ একটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না, হঠাৎ আকস্মিকভাবে ঘটে। যেমন—উচ্চতার হঠাৎ বৃদ্ধি, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও আবেগগত ক্ষেত্রে উৎসাহ ও আগ্রহের হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদি।

৩. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি (Principle of Individual Difference) :** প্রতি জীবসত্তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একেকটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে।

৪. **বিকাশের ধারার সংগতির নীতি (Principle of Uniformity of pattern) :** বিকাশের হারের মধ্যে সংগতির অভাব রয়েছে। বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিবিশেষে বিকাশঘটিত পরিবর্তনের ফলাফলও বিভিন্ন।

৫. **সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দিকে অগ্রসরের নীতি (Principle of proceeding from general to specific responses) :** ব্যক্তিত্বের বিকাশকালীন সময়ে একটি শিশু প্রথমে সাধারণ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। এবং ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ও অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিতে সক্ষম হয়। যেমন— প্রথমে একটি শিশু উদ্দেশ্যহীনভাবে হাত নাড়ে। কিন্তু পরে সে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু ধরার জন্য বা নাগাল পাবার জন্য হাত নাড়ে।

৬. **সংহতির নীতি (Principle of integration) :** বিকাশের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হলো সব ধরনের প্রতিক্রিয়ার একীকরণ বা সংহতি সাধন করা। এই বিষয়ে কুপুস্বামী, (1963) বলেছেন—বিকাশ হল সামগ্রিক থেকে আংশিক এবং আংশিক থেকে সামগ্রিকের প্রতি যাত্রা। অর্থাৎ এটি সামগ্রিক ও আংশিক এবং সুনির্দিষ্ট ও সাধারণ প্রতিক্রিয়া—উভয়েরই একটি সার্থক সংমিশ্রণ যা একটি শিশুর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্তোষজনক বিকাশ ঘটায়।

৭. **আন্তঃসম্পর্কের নীতি (Principle of Inter Relation) :** মানবজীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত। দৈহিকভাবে সুস্থ মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ, অনেক বেশী আবেগ নিয়ন্ত্রিত ও সামাজিকভাবে সচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অপর্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যক্তিকে সামাজিক ও প্রাক্ষোভিকভাবে অসহযোগী করে তোলে।

৮. **মিথস্ক্রিয়ার নীতি (Principle of Interaction) :** বিকাশের সময় ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তিগুলির মধ্যে একটি সক্রিয় আন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া চলে। বৃদ্ধি ও বিকাশের যে কোনো স্তরে একটি ব্যক্তির আচরণ বা ব্যক্তিত্ব গঠন তার সহজাত গুণ বা ক্ষমতা এবং পরিবেশগত পরিকাঠামোর অন্তর্বর্তী মিথস্ক্রিয়ার চরম ফল।

৯. **সেফালোকউডাল এবং প্রক্সিমোডিসটাল প্রবৃত্তির নীতি (Principle of Caphalocaudal and Poximodistal tendencies) :** Caphalocaudal এবং Proximodistal প্রবৃত্তি মূলতঃ বিকাশের সুবিন্যস্ত পর্যায় ও দিক নির্ধারণে সাহায্য করে। Caphalocaudal প্রবৃত্তি অনুসারে, বিকাশের হারের দিকটি লম্বালম্বি অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের দিকে হয়ে থাকে। তাই প্রথমেই দাঁড়াতে সক্ষম হবার আগে একটি শিশু তার হাত ও মাথার ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। তবেই সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে। আর Proximodistal প্রবৃত্তি অনুসারে বিকাশের হারের দিকটি দেহের নিকটবর্তী অংশ থেকে দূরবর্তী অংশের দিকে হয়। শুরুর দিকে একটি শিশু চেষ্টা করে প্রথমে হাতে-পায়ের প্রধান মাংসপেশী গুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ পেতে এবং এর পরেই সে আঙুলের ছোট ও সূক্ষ্ম মাংসপেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করে।

১০. **পূর্ব নির্ধারণের নীতি (Principle of Predictability) :** বিকাশ হলো পূর্ব নির্ধারিত অর্থাৎ বিকাশের ধারা ও পর্যায়ের অন্তর্বর্তী সংহতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে একটি শিশুর এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তার আচরণ বা প্রকৃতি কিরূপ হতে পারে, সে বিষয়ে আগে থেকে মত প্রকাশ করতে পারি। এই পূর্ব নির্ধারণ যে শুধুমাত্র বিকাশের সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, এমনকি একটি নির্দিষ্ট শিশুর ভবিষ্যত বিকাশ কোন দিকে হতে চলেছে তাও পূর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব। যেমন একটি শিশুর হাড়ের গঠন ও বিকাশের হার দেখে প্রাপ্ত বয়স্ককালে তার শরীরের গঠন ও আকৃতি কেমন হবে তা পূর্বানুমান করা যায়।

১১. **আবর্তিত বনাম সরলরৈখিক অগ্রগতির নীতি (Principle of special virus linear advancement) :** শিশুর বিকাশের ধারা কখনোই পুরো সোজা বা সরলরৈখিক হয় না। একটি শিশুর কিছুটা বিকাশ হবার পর, একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে বিকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকে যাতে সেই সময় পর্যন্ত যা বিকাশ ঘটেছে তা দৃঢ় ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাই নতুন বিকাশ শুরুর সময় বিকাশের গতি কিছুটা পিছিয়ে এসে আবার কুণ্ডলির আকারে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

১২. **ক্রমানুযায়ী (Orderly) :** বিকাশ একটি প্রক্রিয়া যা একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে হয়।

১৩. **ক্রমপুঞ্জিত (Cumulative) :** বিকাশ একদিনে হয় না। মানুষের জন্মের পর শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। প্রতিটি স্তরে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, সেটি পরবর্তী স্তরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো স্তরকে কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

১৪. **বিকাশ ও শিখন (Development and learning) :** শিখন হল মানুষের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, শিখন আসলে বিকাশেরই প্রক্রিয়া। শিখনের ফলে ব্যক্তির আচরণধারায় পরিবর্তন সাধিত হয় যার অর্থ বিকাশ সাধন।

১৫. **ঐক্যের নীতি (Principle of Unity) :** বিকাশের ধারা ব্যক্তিজীবনের ঐক্য রাখে। এক ধরনের বিকাশ অন্য বিকাশকে প্রভাবিত করে। দৈহিক বিকাশ যথাযথ না হলে মানসিক বিকাশ হ্রাস পায়। কোনো ধরনের বিকাশ এককভাবে হতে পারে না।

৪.৫ বিকাশের বিভিন্ন দিক ও মাত্রা (Dimensions of Development)

মনোবিদগণ মানব বিকাশকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—

দৈহিক বিকাশ (Physical Development) : জন্মের পর থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত একটি মানবশিশুর শরীরে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাকে বলা হয় দৈহিক বিকাশ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের বিকাশ বা সঞ্চালনমূলক বিকাশ এই দুই ধরনের বিকাশের সাহায্যে শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক বা দৈহিক বিকাশ সাধিত হয়। এই দৈহিক বিকাশের উপর অন্যান্য বিকাশ ও অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যান্য বিকাশ বলতে মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য দৈহিক বিকাশকে মনোসঞ্চালন বিকাশও বলা হয়ে থাকে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) : শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলতে বোঝায় তার শক্তি এবং গতির বিকাশ এবং কত নিখুঁতভাবে সে তার হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য পেশী ব্যবহার করতে পারছে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সঞ্চালন বিকাশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। সঞ্চালনের বিকাশ শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। শিশু তার বৌদ্ধিক কৌতূহল নিবারণের জন্য সঞ্চালনমূলক কার্যাবলির সাহায্যে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। এছাড়া অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা এবং কীভাবে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঞ্চালনমূলক আচরণ শিশুকে সাহায্য করে। শিশুর প্রাক্ষোভিক আচরণেও সঞ্চালনমূলক বিকাশের গুরুত্ব দেখা যায়। কারণ শিশুর, শক্তি, গতি, সংযোজন ক্ষমতা এবং দক্ষতা অনেকাংশে তার সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সাফল্য ও ব্যর্থতা শিশুর সন্তুষ্টি, বিরক্তি, ক্রোধ এবং ভয় ইত্যাদির কারণ হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সঞ্চালনমূলক বিকাশের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। একটি শিশু হয়তো বৌদ্ধিক দিক থেকে খুব অগ্রসর, কিন্তু সঞ্চালনগত বৈশিষ্ট্যে দুর্বল। অপর একটি শিশু হয়তো বাচনিক বুদ্ধির দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু সঞ্চালনসূচক কার্যাবলির ক্ষেত্রে খুব দক্ষ, যার ফলে বৌদ্ধিক শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য শিখনের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত শিশুটি দ্বিতীয় শিশুটির থেকে অনেক বেশি সফল।

মানসিক বিকাশ (Mental Development) : নবজাত মানবশিশু জন্মসময়ে অত্যন্ত অসহায় ও

পরনির্ভর থাকে। অপরের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। নবজাত শিশুর মধ্যে হাঁচি, কাশি, চক্ষু বন্ধ করা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। এ ছাড়াও নবজাত শিশুর মধ্যে কতকগুলি আবেগজাত প্রতিক্রিয়ার ও সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এগুলিই শিশুর বেঁচে থাকার বা বাহ্যজগতের সঙ্গে প্রতিযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য দরকার শিশুর নতুন আচরণ শিক্ষা করার। নতুন আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায় এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশে শিশুকে বাহ্য জগতের সঙ্গে অভিযোজনের সহায়তা করে।

বৌদ্ধিক বিকাশ (Cognitive Development) : জন্মের পর থেকে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা বিকশিত হতে থাকে। এই ক্ষমতাগুলি মূলত অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাগুলিকে প্রয়োগ করে শিশু পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে, কল্পনা করতে পারে ইত্যাদি। এই ক্ষমতাগুলিই হল বৌদ্ধিক ক্ষমতা।

ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা, যেমন—চিন্তন, কল্পন, স্মৃতি ইত্যাদি যেগুলি ব্যক্তিকে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনে সহায়তা করে বা ব্যক্তিকে জটিল কর্মসম্পাদনে সহায়তা করে, সেগুলির বিকাশই হল বৌদ্ধিক বিকাশ।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) : প্রক্ষোভের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Emotion'। লাতিন শব্দ 'Emovere' শব্দ থেকে এসেছে 'Emotion' শব্দটি। Emovere শব্দটির অর্থ বাইরে থেকে পরিচালিত করা (to move out)।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রক্ষোভ হল এক জটিল মানসিক অনুভূতি যা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অঙ্কুরিত হয়। প্রক্ষোভ ব্যক্তির সহজাত ধর্ম। ব্যক্তির মধ্যে আচরণের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার মূলে রয়েছে প্রক্ষোভ। সাধারণভাবে ভয়, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ ইত্যাদির মতো মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রক্ষোভ বলা হয়ে থাকে। মনোবিদগণ মনে করেন, যে কোনো ধরনের বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, বস্তুধর্মী প্রত্যক্ষণের ফলে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন হয় না, বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি করে। এই মানসিক অবস্থাকে বলা হয় অনুভূতি (Feeling)। অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে ভালোলাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি অবস্থাগুলি এক-একটি মানসিক অনুভূতি। কিন্তু, অনেক সময় মানুষের জীবনে এই অনুভূতিগুলি তীব্রতা লাভ করে এবং বিভিন্ন প্রকার বহিরাচরণের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ পায়। যেমন— কোনো জিনিস পছন্দ হলে আমরা আনন্দ করি, মনোমতো জিনিস হাতে না পেলে রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করি ইত্যাদি। এই ধরনের তীব্র মানসিক অনুভূতিগুলিকে বলা হয় প্রক্ষোভ (Emotion)। সহজ কথায়, প্রক্ষোভ হল দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তার সহায়ক এক ধরনের মানসিক অবস্থা।

সামাজিক বিকাশ (Social Development) : একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন সেই শিশুটিকে বলা

হয় ইন্দ্রিয়সর্বস্ব একটি প্রাণী (Asocial)। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে নানাভাবে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং ভাবাদর্শ অনুপ্রবেশ করানো হয়। যে সমাজে শিশুর জন্ম হয়, সেই সমাজের আদবকায়দা, আচার-বিচার শেখানো হয়। ভাবপ্রকাশ ছাড়াও সে অনেক কিছু শেখে। ভাষা শেখার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সমাজের ঐতিহ্য সেই সমাজে প্রচলিত ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এবং বিভিন্ন শব্দের আকারে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে তাকে নানা উপায়ে গড়েপিঠে সমাজের উপযুক্ত মানবশিশুতে রূপান্তরিত করার নাম সামাজিকীকরণ (Socialization)। অতি শৈশবে শিশু যা ভাবে, সেটা তার বাইরের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে দীক্ষিতকরণ (Social indoctrination) বলা হয়। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল যাবৎ দীক্ষিতকরণ চলার ফলে সমাজে বসবাসকারী লোকদের সামাজিক ভাবাদর্শ এবং আচরণবিধি মেনে চলার অনুকূল মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়। সমাজ নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে সামাজিক আচারবিচার ও আচরণ বিষয়ে অভ্যস্তকরণ (Habituation) বলা হয়। সুতরাং সমাজ নির্ধারিত নিয়মকানুন, রীতিনীতির ধারার মধ্যে দিয়ে শৈশব অবস্থা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা ব্যক্তিজীবনে সতত ক্রিয়াশীল, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক বিকাশ ঘটে। এককথায়, শিশুর সামাজিক আচার-আচরণের প্রক্রিয়াকেই সামাজিক বিকাশ (Social Development) বলে অভিহিত করা হয়।

নৈতিক বিকাশ (Moral Development) : নৈতিকতা হল ভালোমন্দের বিচারকরণের ক্ষমতা। ভালো বা খারাপ নির্ধারিত হয় সমাজ ও কৃষ্টির মানদণ্ডের উপর। একটি শিশুর জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণ অর্জিত হয় যেগুলির উপর পারিবারিক, সামাজিক তথা কৃষ্টিগত প্রভাব লক্ষ করা যায়। এটাই হল নৈতিক বিকাশ (Moral Development)। সামাজিক ও কৃষ্টিগত রীতিনীতি, নিয়ম-কানুনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির যথোপযুক্ত আচরণ প্রক্রিয়াই হলো নৈতিক বিকাশ।

৪.৬ সারাংশ (Summary)

মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসে। যেমন— দৈহিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি। এই পরিবর্তন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন বৃদ্ধি (Growth), বিকাশ (Development), পরিণমন (Maturation)। বৃদ্ধি ও বিকাশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৃদ্ধি হল মানুষের একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন যার ফলে শারীরবৃত্তীয় ও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। বিকাশ হল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। বৃদ্ধি পরিমাণগত (Quantative), বিকাশ পরিমাণগত ও গুণগত (Quantative and Qualitative)। এই ইউনিটে বৃদ্ধি ও বিকাশের সমগ্র বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বৃদ্ধি, বিকাশ ও পরিণমন—এই তিনটি ধারণার মধ্যে বিকাশের ধারণাটি হল সর্ববৃহৎ ও সামগ্রিক। বিকাশের বিভিন্ন নীতিগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নীতিগুলি যথাক্রমে ধারাবাহিক (Continuous), ক্রমানুযায়ী (Orderly), ব্যক্তিবৈষম্য (Individual Difference),

ক্রমপুঞ্জিত (Cumulative), বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক (Inter-relation among different aspects), বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়তার ফল (Development is the product of interaction between heredity and environment), বিকাশ ও শিখন (Development and learning)। মানব বিকাশের বিভিন্ন ভাগগুলি হল— দৈহিক বিকাশ (Physical Development), সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) মানসিক বিকাশ (Mental Development), বৌদ্ধিক বিকাশ (Cognitive Development), প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development), সামাজিক বিকাশ (Social Development), নৈতিক বিকাশ (Moral Development)—এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. বৃদ্ধি ও বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

২. বৃদ্ধি ও বিকাশ এর পার্থক্য কি?

৩. বিকাশের দুটি নীতি আলোকপাত করুন।

৪. মানব বিকাশের দিক বা মাত্রাগুলি কি কি?

৫. বৃদ্ধির দুটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California

Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ৫ ❑ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি : জৈবিক, আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক (Perspectives of Educational Psychology : Biological, Behavioral and Cognitive)

গঠন **(Structure)**

৫.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৫.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৫.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি **(Biological Perspectives of Educational Psychology)**

৫.৪ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি **(Behavioural Perspective of Education Psychology)**

৫.৫ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি **(Cognitive Perspective of Educational Psychology)**

৫.৬ সারাংশ **(Summary)**

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবে।
- শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবে।
- শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবে।
- শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে।

৫.২ ভূমিকা (Introduction)

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিদ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্যতম। জৈবিক দৃষ্টিকোণ বা বায়ো-সাইকোলজি

একটি সর্বশেষ বিকাশ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

জৈব মনোবিদ্যা বিভিন্ন জৈবিক নির্ধারক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রক্রিয়া অনুভূতি এবং প্রজ্ঞামূলক কার্য্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। আচরণবাদ মনোবিদ্যা ব্যক্তির বাহ্যিক দিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রজ্ঞামূলক দিক মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়।

৫.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Perspective of Educational Psychology)

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিদ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্যতম, যা মানবদেহের বিভিন্ন দিকের যেমন শারীরবৃত্তীয় শক্তি, মস্তিষ্ক, নিউরোট্রান্সমিটার এবং মানুষের আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এর সাহায্য করে। জৈবিক দৃষ্টিকোণ বা বায়ো-সাইকোলজি একটি সর্বশেষ বিকাশ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র যা একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করেছে সাম্প্রতিক সময়ে। মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটির দ্বারা বিভিন্ন পরিচিতি বিষয় যেমন মনোজৈবিক, জৈবিক মনোবিদ্যা, আচরণবাদ নিউরো সাইন্স এবং শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি মনোবিদ্যার শিক্ষার বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ করেছে। মনোবিদ্যার এই শাখাটি মানুষের আভ্যন্তরীণ আচরণের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে। মানুষের আচার-আচরণ অনুভূতি এবং চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও জৈবিক ভিত্তি অন্যতম। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আচার আচরণ, চিন্তা চেতনা ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জৈবিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের শারীরবৃত্তীয় ঠিক তাদের আচরণের বহিঃ প্রকাশ ঘটায় যার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকে। জৈব মনোবিদ্যা বিভিন্ন জৈবিক নির্ধারক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রক্রিয়া অনুভূতি এবং প্রজ্ঞামূলক কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৫.৪ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural Perspective of Educational Psychology)

আচরণবাদী মনোবিদগণের মতে, আচরণবাদী শিখন হল অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন। প্রাণীর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় উদ্দীপনার প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে (S-R) এবং অর্জিত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন বিষয় আয়ত্ব করতে বা আচরণের পরিবর্তন করতে বা শিখন লাভে সাহায্য করে। বিভিন্ন আচরণবাদী মনোবিদগণের প্রবর্তিত 'আচরণগত শিখন তত্ত্ব' (Behavioural learning theory) সমূহের মাধ্যমে 'কীভাবে আমরা শিখন লাভ করি', তা জানতে পারি।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটি অন্যতম দিক হলো আচরণবাদ মনোবিদ্যা যা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক দিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে তার সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে পরিবেশগত উদ্দীপনার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া আমাদের ক্রিয়াগুলিকে গঠন করে। আচরণবাদ যা আচরণগত মনোবিদ্যা নামে পরিচিত, এর উপর ভিত্তি করেই শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে সাহায্য করেছে। আচরণবাদীরা বিশ্বাস করেন যে আমাদের প্রতিক্রিয়া পরিবেশগত উদ্দীপনা আমাদের কর্মকে রূপ দেয়।

৫.৫ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Perspective of Educational Psychology)

১৮৭৯ সালে মনোবিজ্ঞানী উইলহেম উন্ড দ্বারা মনোবিজ্ঞান এর উপর একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন পরীক্ষাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার উপর কাজ শুরু হয়। আচরণবাদ মনোবিদ্যার পরেই প্রজ্ঞামূলক মনোবিদ্যার সাড়া পড়ে সারা বিশ্বজুড়ে। প্রজ্ঞামূলক দিক মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। মানসিক প্রক্রিয়া বলতে এখানে স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রক্রিয়াটি হল ইনপুট-প্রক্রিয়া-আউটপুট (Input-process-Output)।

যখন ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের "সার্বিক অবস্থাকে" (Whole pattern) অনুধাবনের মাধ্যমে বিষয়কে আয়ত্ত করে বা আচরণের পরিবর্তন করে তখন প্রজ্ঞামূলক শিখন হয়। অর্থাৎ, এই ধরনের শিখনে ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ের আংশিকভাবে প্রত্যক্ষণ না করে, বরং সমগ্র অংশের একটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে। এই সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করতে ব্যক্তি নিজস্ব প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, যুক্তি, স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদিকে কাজে লাগায়।

৫.৬ সারাংশ (Summary)

শিক্ষা মনোবিদ্যা দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। শিক্ষা ও মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যা হল আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান। শিক্ষা হল মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরণ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকাশকে বোঝানো হয়েছে।

Skinner এর মতে, "Educational Psychology covers the entire range of behaviour and personality as related to education."

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ। মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণকে অনুশীলন করা, আচরণ মানে শুধুমাত্র জৈবিক দিক নয়। মানসিক দিকের অনুশীলনও মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। মানুষের অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের অনুশীলন করা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

জীববিজ্ঞান, আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণও এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিদ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্যতম এই শাখাতে দৈহিক গঠনের প্রেক্ষিতে মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক সংগঠনের বা পরিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আচরণের সাথে দেহের অংশকে সম্পর্কিত করা হয়। কেউ কিছু মনে করতে না পারলে আমরা ভাবি তার মাথায় কিছু সমস্যা আছে। মস্তিষ্কের কোন অংশ দ্বারা কোন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় তা জানা দরকার। মস্তিষ্কের কার্যাবলী যেমন সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, ও আগ্রহ যা কেবল মানসিক ক্রিয়াগুলিকে সম্পন্ন করে যা শিখনের কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়।

মনোবিদ্যার এই শাখাটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে।

আচরণবাদী শাখায় পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি পরিবেশ ও মানব বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়। Woodworth শিখন বলতে সেই ধরনের সক্রিয়তাকে বলেছেন যা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন আনে। ব্যক্তির পূর্ববর্তী আচরণ ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটায়। আচরণবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া হল বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধনের (S-R Bond) ফলেই শিখন ঘটে।

আচরণবাদ মনোবিদ্যার পরেই প্রজ্ঞামূলক মনোবিদ্যার সাড়া পড়ে সারা বিশ্বজুড়ে। প্রজ্ঞামূলক দিক মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। প্রজ্ঞামূলক মনোবিদ্যা ব্যক্তির চিন্তন, স্মৃতি, ভাষা, বিকাশ এবং অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দেয়। মানসিক প্রক্রিয়া বলতে এখানে স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রজ্ঞামূলক মনোবিদরা শিশুদের শিখনের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী। মানুষের আচরণের কারণ, বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎবাণীর জন্য প্রয়োজন হল দেহের সংগঠন এবং দৈহিক যন্ত্রাদির কাজকর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান।

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝেন?

২. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ দিন।

৪. প্রজ্ঞামূলক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

৫. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৬. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ দিন।

৭. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানে প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝেন?

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ৬ ❑ বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব (Developmental stages and its impact on Education)

গঠন **(Structure)**

৬.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৬.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৬.৩ শৈশবকাল **(Infancy)**

৬.৩.১ শৈশবকাল ও শৈশবের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য **(Infancy and Developmental characteristics of Infancy)**

৬.৩.২ শৈশবের চাহিদা ও চাহিদা পূরণে পিতামাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা **(Infancy needs and the role of parents, school and family and the developmental needs of infancy)**

৬.৪ বাল্যকাল **(Childhood)**

৬.৪.১ বাল্যকালের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য **(Developmental Characteristics of Childhood)**

৬.৪.২ বাল্যকালের বিকাশের মৌলিক চাহিদা **(Fundamental Needs of Childhood)**

৬.৪.৩ বাল্যকালের বিকাশগত চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা **(The role of Parents and Schools in the Developmental Needs of Childhood)**

৬.৫ কৈশোরকাল **(Adolescence)**

৬.৫.১ কৈশোরকালের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য **(Developmental Characteristics of Adolescence)**

৬.৫.২ কৈশোরকালের মৌলিক চাহিদা **(Fundamental Needs of Adalescence)**

৬.৫.৩ কৈশোরের সমস্যাসমূহ **(Problems of Adolescence)**

৬.৫.৪ কৈশোরকে ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বলার কারণ **(Reason for calling adolescence stress and storms)**

৬.৫.৫ কৈশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় এবং পরিবারের ভূমিকা (The role of school and family in solving various problems of adolescence)

৬.৬ সারাংশ (Summary)

৬.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে—

- বিকাশের পর্যায় এবং শিক্ষার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা গঠন হবে।
- শৈশবের বিভিন্ন চাহিদা সংক্রান্ত ধারণার গঠন হবে।
- কৈশোরের মৌলিক চাহিদাগুলি সম্বন্ধে ধারণা প্রাপ্ত হবে।
- কৈশোরের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবে।
- কৈশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় এবং পরিবারের ভূমিকা কি তার সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হবে।

৬.২ ভূমিকা (Introduction)

শৈশবকালে শিশুর দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয়। শৈশবের বিভিন্ন ধরনের বিকাশ হল— দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, শৈশব স্তরে শিশুর কতগুলি চাহিদা পরিলক্ষিত হয়— দৈহিক চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, পুনরাবৃত্তির চাহিদা, ঘুমের চাহিদা, বয়স বাড়ার সঙ্গে শিশুর নানারকম মানসিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। শৈশবের শৈশবকালকে বাস্তব রূপায়ণের জন্য পিতামাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নে আলোচিত হবে। অনুরূপে বাল্যকালের চাহিদা ও চাহিদা পূরণে পিতামাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের অনবদ্য ভূমিকাও আলোচিত হবে।

৬.৩ শৈশবকাল (Infancy)

জন্মের পর থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাস্তর অনুযায়ী এই স্তরকে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর বলা হয়। এই স্তরে শিশুর বিকাশের হার খুব বেশি থাকে। এই স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—

1) প্রাথমিক শৈশবের স্তর (Early Infancy)

2) প্রান্তীয় শৈশবের স্তর (Late Infancy)।

৬.৩.১ শৈশবের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য (Development Characteristics of Infancy)

শৈশবকাল (জন্মের পর থেকে ২ বছর) : এই স্তরের বয়সসীমা জন্ম থেকে ২ বছর। এই সময় শিশুর দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয়। মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশও কিছুটা ঘটে। শৈশবের বিভিন্ন ধরনের বিকাশ হল—

(ক) দৈহিক বিকাশ (Physical Development) : শিশুর জন্মের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বিকাশ সম্পন্ন হয়। যেমন—

(১) ওজনগত পরিবর্তন (Weight Change) : জন্মের মুহূর্তে শিশুর ওজন সাধারণত তিন কেজি হয়। এই ওজন পাঁচ মাসের মধ্যে বেড়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় কেজি হয়। এক বছরের মধ্যে তিন গুণ বা নয় কেজি এবং দুই বছরের মধ্যে চারগুণ বা বারো কেজি হয়।

(২) উচ্চতাগত পরিবর্তন (Height Change) : শিশুর উচ্চতা বংশগতির উপর নির্ভর করে। তবে শিশুর জন্মের সময় যে উচ্চতা থাকে তার প্রথম বছরে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হয় এবং দু'বছরে পঁচাত্তর শতাংশ বৃদ্ধি হয়।

(৩) মাংসপেশির বৃদ্ধি (Muscle growth) : এই স্তরে শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশির দ্রুত বৃদ্ধি হয়। এই স্তরে দুই ধরনের বৃদ্ধি দেখা যায়—

1. **Cephalocaudal Tendency :** এই ধরনের বৃদ্ধিতে মাংসপেশি বৃদ্ধি মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত হয়।

2. **Proximodistal Tendency :** এই ধরনের বৃদ্ধিতে দেহের মধ্যবর্তী স্থান থেকে মাংসপেশির বিকাশ শরীরের শেষ পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে।

(৪) সম্পূর্ণ কার্যাবলী (Complete functions) : এই স্তরে শিশু কেবল মাথা নাড়াতে, rooting এবং sucking করতে পারে।

(খ) মানসিক বিকাশ (Mental Development) : শৈশবে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন মানসিক বিকাশের স্তর দেখা যায়। পিঁয়াজে-এর মতে বিকাশমূলক দিক হলো—

(১) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) : জন্মের সময় শিশুর কিছু ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে এবং কিছু তৈরি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। যেমন— আঁকড়ে ধরা (Graspring), চোষা (Sucking) ইত্যাদি। এই স্তরের শেষের দিকে তার স্কিমার বিকাশ ঘটে।

(২) **পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া (Repetitive action) :** শৈশবে শিশুদের কোন একটি আচরণ একইভাবে বারে বারে করতে দেখা যায়। যাকে পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া বলা হয়। এই প্রক্রিয়া তিন ধরনের হয়—

1. **প্রথম শ্রেণি (১ থেকে ৪ মাস) :** শিশু নিজের শরীরের কোন অংশ হিসেবেই পুনরাবৃত্তি করে। যেমন—আঙ্গুল চোষা।
2. **দ্বিতীয় শ্রেণি (৪ থেকে ৮ মাস) :** শিশু বাইরের কোনো বস্তু নিয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। যেমন—ঝুনঝুনি বাজানো।
3. **তৃতীয় শ্রেণি (১২ থেকে ১৮ মাস) :** শিশু চেষ্টা করে নতুন কোন কাজ করতে এবং তার ফলাফল অন্য কাজও একি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। যেমন— শিশুর হাত থেকে বাটি পড়ে গেলে তাতে শব্দ হলে অন্য বস্তুকেও ফেলার চেষ্টা করে শব্দ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য।

(৩) **বস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা (The idea of the stability of an object) :** শিশু জন্মের পর কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে তা বুঝতে পারে না।

(৪) **কল্পনার ছলে খেলা (Playing with the trick of imagination) :** এই স্তরে শিশুরা সারাদিনের কার্যকলাপে কল্পনা করে খেলার ছলে সেটাকে অভিনয় করে।

(গ) **সামাজিক বিকাশ (Social Development) :** শৈশবে শিশুর মধ্যে সামাজিক বিকাশ খুব একটা দেখা যায় না। তবে মা বাবা পরিবারের সাহচর্যে তাদের মধ্যে কিছুটা সামাজিক বিকাশ দেখা যায়। যেমন, এরিকসনের মত অনুযায়ী—

১. শৈশবে শিশুর মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। উপযুক্ত পরিচর্যা ও ভালোবাসা পেলে তার মধ্যে বিশ্বাস ও নিরাপত্তা বোধ তৈরি হয় যা তাকে পরিবারের বাইরের পরিবেশ ও সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা হয় যার ফলে সামাজিক অসঙ্গতি দেখা যায়।

২. এক থেকে দুই বছরের শিশুদের মধ্যে লজ্জা ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। নিজের মতো করে পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারলে সে স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। তা না হলে তার মধ্যে সন্দেহ বা লজ্জার অনুভূতি তৈরি হয় এবং শিশু স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।

এছাড়াও এই স্তরে শিশুরা খুব আত্মকেন্দ্রিক হয় বলে সমবয়সীদের সঙ্গে বেশিক্ষণ মানিয়ে চলতে পারে না। প্রাথমিকভাবে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া করে।

(ঘ) **ভাষাগত বিকাশ (Language Development) :** শৈশবে শিশুর ভাষার বিকাশ বিভিন্ন স্তরে হয়ে থাকে। যেমন—

❖ **প্রথমত,** শিশুর জন্মের পর দুই মাসের কাছাকাছি সময় এক ধরনের স্বরবর্ণের মত শব্দ করতে শেখে। একে Cooing বলে।

দ্বিতীয়ত, চার মাস বয়সের কাছাকাছি সময় শিশু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণে এক ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। যেমন—ম্যা-ম্যা। একে Babling বলে।

তৃতীয়ত, দশ থেকে বারো মাস বয়সী শিশু প্রথম শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। শিশু একটি শব্দ তার সাথে ইশারা দিয়ে মনের ভার বোঝাতে পারে যাকে Holophrase বলে।

চতুর্থত, বারো থেকে আঠারো মাস বয়সী শিশুর স্পষ্টভাবে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডার পঞ্চাশের বেশি হয়।

পঞ্চমত, আঠারো থেকে চব্বিশ মাস বয়সী শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে দুই শত এর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং শিশুটির দুটো শব্দ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় একে Telegraphic Speech বলে।

(ঙ) **প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) :** প্রথম অবস্থায় জন্মের দুই বছর পর্যন্ত শিশুর প্রক্ষোভ সাধারণত শিশুর প্রাথমিক চাহিদা এবং প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। সহজ কথায়, সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী বা উদ্দীপক শিশুর চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। শৈশবের প্রাক্ষোভিক বিকাশ প্রসঙ্গে Watson বলেছেন—

১) মানুষ জন্মের সময় কেবল তিন ধরনের প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যথা— রাগ, ভয়, ভালোবাসা।

২) এই স্তরের শেষ পর্যায়ে আরো কিছু প্রক্ষোভ যেমন— হিংসা, ঘৃণা, আনন্দ, খুশি ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে।

৬.৩.২ শৈশবের চাহিদা ও চাহিদা পূরণে পিতামাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা (Infancy needs and the role of parents, school and family and the developmental needs of infancy)

শৈশবের চাহিদা (Infancy Needs) : শৈশবে শিশুর বিকাশের হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয়। সাধারণত জন্ম থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে শিশুর শৈশবকাল বলে ধরা হয়। জন্ম মুহূর্তে শিশু থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। এই স্তরে শিশু পরিপূর্ণ মানুষের প্রায় সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে। তাই এই শৈশব স্তর মানুষের জীবন বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। এই স্তরে শিশুর জীবন বিকাশের

কতগুলি চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। যার নিম্নরূপ—

(ক) **দৈহিক চাহিদা (Physical Needs) :** শৈশব স্তরে শিশুর দেহের কর্মেন্দ্রিয় পেশিগুলিতে বিকাশের ফলে সঞ্চালনমূলক গতি আসে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শিশু পৃথকীকরণ ও বিভিন্ন কাজের সাদৃশ্য বজায় রাখতে পারে। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদাগুলি হল দৈহিক চাহিদা। এই চাহিদাগুলি সর্বজনীন ও সহজাত। শিক্ষার উপর এগুলি নির্ভর করে না। শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক চাহিদা হল—

১) **খাদ্যের চাহিদা (Needs of food) :** দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির দরুন শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয়। বয়স যত বাড়তে থাকে শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদাও তত বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় শিশু হাতের সামনে যা পায় তাই সে ভক্ষণ করার চেষ্টা করে।

২) **সক্রিয়তার চাহিদা (Needs of activism) :** কর্মেন্দ্রিয় ও পেশিতন্ত্রের বিকাশের ফলে শিশুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সুসামঞ্জস্যভাবে সঞ্চালিত ও ব্যবহার করতে চায়। এর ফলে তার মধ্যে যে ধরনের চাহিদার উদ্ভব হয় তাকে বলে সক্রিয়তার চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশু সব সময় কিছু না কিছু কাজ করতে চায় কিংবা খেলা করতে চায়।

৩) **পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Need for repetition) :** দৈহিক সক্রিয়তার জন্য শিশুর মধ্যে আরও এক ধরনের চাহিদা লক্ষ করা যায়। এটি হল পুনরাবৃত্তির চাহিদা। এই চাহিদার দরুণ শিশু একই রকমের কাজ বারবার সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনও জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার পর সেটি শিশুর হাতে ধরিয়ে দিলে তা আবার সে ছুঁড়ে দেয়। একই ধরনের কাজ বারবার সম্পাদন করার মাধ্যমে সে তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

৪) **ঘুমের চাহিদা (Need for sleep) :** ঘুম মানুষ থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর একটি স্বতঃস্ফূর্ত জৈবিক চাহিদা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশুর মধ্যে এই চাহিদা বর্তমান থাকে।

(খ) **মানসিক চাহিদা (Mental Needs) :** শিশুর মানসিক প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত চাহিদাগুলোকে বলা হয় মানসিক চাহিদা। মানসিক চাহিদা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সমস্ত মানসিক প্রবণতা আছে সেগুলি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হতে না পারলে মানসিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে নানা ধরনের মানসিক চাহিদা দেখা দেয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চাহিদাগুলি হল—

১) **আয়ত্তে আনার চাহিদা (Demand for control) :** জন্মানোর পর শিশু শায়িত অবস্থায় থাকে। সে হাত-পা পরিচালনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। শিশু

আত্মকেন্দ্রিক তাই সে যখন কোন জিনিসকে ধরে শক্ত মুঠিতে আবদ্ধ করে মুঠি যত দৃঢ় হয় ততই তার আয়ত্তে আনার ক্ষমতা প্রবল হতে থাকে।

২) **অভিজ্ঞতা চাহিদা (Expereince demands) :** শিশুর কৌতূহল প্রবণতা তার বিভিন্ন ধরনের চাহিদা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তাকে নতুন নতুন বস্তু-সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট করায় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। চাহিদার ফলে শিশু অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। অভিজ্ঞতা অর্জনের তাগিদেই সে আগুনে হাত দেয় না।

৩) **নিরাপত্তার চাহিদা (Needs for security) :** শিশু সব সময় বয়স্কদের কাছ থেকে নিরাপত্তা আশা করে। নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে কিংবা ব্যাঘাত ঘটলে শিশুর মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় তাকে বলে নিরাপত্তার চাহিদা। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা বিভিন্ন দিক (যেমন—দৈহিক, মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক) থেকে সৃষ্টি হতে পারে।

৪) **ভালোবাসার চাহিদা (Need for Love) :** ভালোবাসার অভাব ঘটলে শিশুর মধ্যে এই ধরনের চাহিদার উদ্ভব ঘটে। এই চাহিদাটি শিশুর কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রবল। একদিকে শিশু যেমন অপরের কাছ থেকে ভালোবাসা আশা করে, অন্যদিকে তেমনি সে অপরকে ভালোবাসতে চায়।

৫) **আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for self-expression) :** শিশু সবসময় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। এই চাহিদা থেকে শিশুর মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা জন্মায়। বিশেষভাবে এই চাহিদার জন্য শিশু ছবি আঁকে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসে।

৬) **অনুকরণের চাহিদা (Need for imitation) :** শিশু খুব সহজেই অপরের আচরণ অনুকরণ করতে পারে। অনুকরণের মাধ্যমেই তারা বয়স্কদের আচরণ আয়ত্ত করে। এই সময়ে তাদের অনুকরণ করার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই ধরনের প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুর মধ্যে অনুকরণের চাহিদা দেখা দেয়।

৭) **কৌতূহলের চাহিদা (Need for Curiosity) :** কৌতূহলের চাহিদা শিশুর মধ্যে থাকার জন্যই শিশু বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কৌতূহলের প্রবণতা থেকে তার মধ্যে উদ্ভূত হয় কৌতূহলের চাহিদা। এই ধরনের চাহিদা শিশুকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আগ্রহী করে তোলে। এর ফলে তার জ্ঞানভাণ্ডারটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) **সামজিক চাহিদা (Social Needs) :** পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার ফলে শিশুর মধ্যে কিছুটা সামাজিক বোধ গড়ে ওঠে। এই ধরনের অনুভূতি থেকে তাদের মধ্যে সামাজিক চাহিদা উদ্ভূত হয়। তবে এই সময়ের সামাজিক চাহিদাগুলি কোনও সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী চাহিদা নয়। বয়স

বাড়ার সঙ্গে সামাজিক চাহিদাগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

১) **সহযোগিতার চাহিদা (Need for Cooperation) :** এই চাহিদার জন্য শিশুরা সমবয়সীদের সঙ্গে একত্রে চলাফেরা করে। তবে এই ধরনের চাহিদা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণ পরেই তাদের মধ্যে বিরোধিতার মনোভাব লক্ষ করা যায়।

২) **সমবেদনার চাহিদা (Need for compassion) :** শৈশবে সংবেদনশীলতার চাহিদা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। শিশু তার শিক্ষিত সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করে। অপরদিকে অন্যের কাছ থেকেও সমবেদনা প্রত্যাশা করে।

৩) **প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা (Demand for competition) :** শিশুর আয়ত্তে আনার চাহিদা সামাজিক পরিবেশে সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। শিশুরা নিজের জিনিস আয়ত্তে রাখার জন্য অথবা অন্যের জিনিসকে আয়ত্তে আনার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ করতে চায়। যা ভবিষ্যতে শিশুর মধ্যে Competitive mind তৈরি করে দেয়।

৪) **সাহচর্যের চাহিদা (The need for companionship) :** শিশুর আরও এক ধরনের চাহিদা হল সাহচর্যের চাহিদা। এই চাহিদাটির তাড়নায় শিশু অপরের সঙ্গ কামনা করে। বিশেষভাবে সমবয়স্ক শিশুদের সাথে তারা খেলতে বা মিশতে বেশি পছন্দ করে। এর জন্য শিশু সমবয়স্ক অন্য শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় এবং খেলা করতেও চায়।

৫) **সামাজিক অনুমোদনের চাহিদা (Demand for social approval) :** শিশু তার বিভিন্ন কাজের জন্য বয়স্কদের সমর্থন আশা করে। অর্থাৎ শিশু মনে করে যে, তার কাজটি আর পাঁচজন মেনে নিক। শিশুর এই ধরনের চাহিদাকে বলে সামাজিক অনুমোদনের চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশু প্রত্যাশা করে যে তার কাজকে বয়স্করা প্রশংসা করুক।

৬) **আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা (Need for self-establishment) :** দুই বা তিন বছর বয়সে শিশুর মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে শিশু নিজেকে অপরের কাছে জাহির করতে চায়। এই সময় নিজের কাজের জন্য শিশু প্রতিষ্ঠা পেতে বা বয়স্কদের স্বীকৃতি পেতে চায়। শিশুর এই ধরনের চাহিদার নাম আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা।

(গ) **প্রাক্ষোভিক চাহিদা (Emotional Needs) :** শৈশবে শিশুর জন্মগত প্রাক্ষোভিক বিষয়বস্তুগুলি স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে চায়। বাধা দিলে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। শিশু এক্ষেত্রে বয়স্কদের সমর্থন পেতে চায়, এই সমর্থন পাওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রাক্ষোভিক চাহিদা তথা স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা তৃপ্ত হয়।

উপসংহার (Conclusion) : যে সমস্ত চাহিদাগুলি পূর্বে আলোচনা করা হল তার মধ্যেই শিশুর সব

চাহিদা সীমাবদ্ধ নয়। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে আরো নানা ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। আবার সামাজিক পরিবেশের চাপে চাহিদাগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, চাহিদাগুলিই আচরণের উৎস। চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হলে আচরণের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় না। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন শিশুর চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হতে পারে না। চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থেকে গেলে শিশু নানা ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ শুরু করে। চাহিদার অতৃপ্তির জন্য যে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয় তার তাড়নায় শিশু এই ধরনের সমস্যামূলক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সমস্ত শিশুদের সমস্যামূলক শিশু (Problem Child) হিসাবে অভিহিত করেন। এই অবস্থায় তারা এর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন না। এই সমস্ত শিশুরা ধীরে ধীরে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সম্পাদন করে। তখন তাদের বলা হয় অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু (Maladjusted Child)। কিন্তু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য শিশর চাহিদাগুলি একান্তভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবেই তার মানসিক স্বস্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেজন্য অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে যেন শিশুর চাহিদাগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

৬.৪.৩ বাল্যকালের বিকাশগত চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা (The role of Parents and Schools in the Developmental Needs of Childhood)

জীবের জীবন বিকাশের প্রথম পর্যায় হলো শৈশব, এই স্তরে জীবন বিকাশটি পরিপূর্ণ হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং শিশুর শৈশবকালকে বাস্তব রূপায়নের জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা হল নিম্নরূপ—

প্রথমত, দৈহিক বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে কিছু অভ্যাস গঠিত হয়। পিতা-মাতাকে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিশুর সু-অভ্যাস গঠিত হয় এবং কু-অভ্যাসগুলি দূর হয়। পরিবার তথা পিতা-মাতা এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে শিশুর সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, শিশুর কল্পনার বিকাশ যাতে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় তার জন্য ছড়া, কবিতা, গল্প, খেলা নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, শৈশবে শিশুর ছন্দ ও গানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এটিকে প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। খেয়াল রাখতে হবে শিশুর মধ্যে যে সৃষ্টি সুলভ মননটি বর্তমান তাকে উৎসাহিত করে সার্থক বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।

চতুর্থত, পিতা-মাতা শিশুর প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন। কারণ গৃহপরিবেশে শিশু যে সমস্ত আচরণ আয়ত্ত করবে সে পরবর্তী সমাজ পরিবেশে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

পঞ্চমত, শিশু সামাজিকভাবে দল গঠন করতে গিয়ে অনেক সময় খারাপ সঙ্গের সাথী এদের সংস্পর্শে এসে কু-অভ্যাস আয়ত্ত করে। পিতা-মাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কু-অভ্যাসগুলো শিশুর জীবনে হানি না ঘটায় সেটিকে নজর দেওয়া। বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠনে ও সামাজীকিকরণে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের ন্যায় সকল দেশের শিশুর প্রতি পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যত্নের সাথে প্রতিপালন, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন পিতা-মাতার কর্তব্য বিশেষ। এটা অন্য দেশে বিরল। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় শুধুমাত্র প্রক্ষোভজনিত কারণে শিশুর দায়িত্ব পালন এবং শিশু যাতে ভবিষ্যতে সুসভ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমাজে সে দিকেও পিতা-মাতাকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারের পরেই বিদ্যালয় শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৬.৪ বাল্যকাল (Childhood)

৬.৪.১ বাল্যকালের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য (Development Characteristics of Childhood):

এই স্তরের সম্পূর্ণ বয়সসীমা দুই থেকে এগারো বছর পর্যন্ত। দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত আদি বাল্যকাল এবং পাঁচ থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর বাল্যকাল বলে। এই স্তরের কিছু বিকাশগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(ক) দৈহিক বিকাশ (Physical Development) :

১) ওজনগত পরিবর্তন (Weight changes) :

আদি বাল্যকাল (Early Childhood) : দুই থেকে তিন বছর বয়সী একটি স্বাভাবিক শিশুর ওজন ১২-১৫ কেজি হয় এবং পাঁচ বছরে তা বেড়ে ১৮ কেজি হয়।

উত্তর বাল্যকাল (Late Childhood) : এই স্তরে শিশুর বৃদ্ধি খুব ধীরে সম্পন্ন হয় এবং বৃদ্ধি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

২) উচ্চতার পরিবর্তন (Height Change) :

আদি বাল্যকাল (Early Childhood) : আদি বাল্যকালে শিশুর উচ্চতা স্বাভাবিকভাবে ৯০ সেমি. থেকে প্রায় ১০০ সেমি. বেড়ে যায়।

উত্তর বাল্যকাল (Late Childhood) : উত্তর বাল্যকালে শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

৩) অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (Psychomotor Skill) : এই স্তরে শিশু যে সমস্ত অঙ্গ

সঞ্চালনমূলক কাজ করতে সক্ষম হয় সেগুলি হল—

বয়স	অঙ্গ সঞ্চালন মূলক দক্ষতা
২-৩ বছর	● এই বয়সে শিশু ছন্দে হাঁটতে দ্রুত হাঁটতে এবং দ্রুত দৌড়াতে পারে।
	● শিশু শরীরের উপরের অংশ অনমনীয় রেখে লাফাতে, কোন বস্তু ছুড়তে পারে।
	● শিশু পায়ের সঞ্চালন করে খেলনা গাড়ি চালাতে পারে।
৩-৪ বছর	● এই বয়সে শিশু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে পারে।
	● লাফাতে দৌড়াতে ও শরীরের উপরের অংশের নাড়াচাড়া করতে পারে।
৪-৫ বছর	● দ্রুত দৌড়াতে পারে।
	● সাইকেল চালাতে পারে।
	● জোরে হাঁটতে পারে।
৫-৬ বছর	● এই বয়সে দৌড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পায়।
	● সমস্ত শরীরকে উপরে ছুড়তে পারে।
	● বাই-সাইকেল চালাতে পারে।
৭-১১/১২ বছর	● এই বয়সে দৌড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পায়।
	● ফুটবল, ক্রিকেট এই সমস্ত খেলা খেলতে পারে।
	● নিজের ইচ্ছানুযায়ী শরীরকে সঞ্চালন করতে পারে।

৪) **অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন (Other Physical Changes) :** দুই (২) থেকে এগারো (১১) বছর পর্যন্ত বয়সে শিশুর দীর্ঘ পেশীগুলি দ্রুত ও সুষমভাবে বৃদ্ধি পায়। কিছু জৈবিক পরিবর্তন যেমন— শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎযন্ত্রের গতি হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) ভাষাগত বিকাশ (Language Development) :

১) দুই থেকে তিন বছর বয়সে শিশুদের শব্দভাণ্ডার বাড়তে থাকে এবং ভাষাগত বিকাশ দ্রুত হয়।

২) পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারের কাছাকাছি হয়। এই সময় শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় বাইশটি শব্দ শিখতে পারে।

৩) ছয় থেকে আট বছর বয়সের শিশুর সামাজিক বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪) নয় থেকে এগারো বছর বয়সের শিশুর সংজ্ঞা নিরূপণ, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ ইত্যাদির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) **মানসিক বিকাশ (Mental Development) :** পিঁয়াজে-এর মানসিক বিকাশ তত্ত্বে আদি বাল্যকাল এবং প্রান্তীয় বাল্যকাল অনুযায়ী শিশুর মানসিক বিকাশগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

আদি বাল্যকাল (Early Childhood) :

১) **সাংকেতিক চিন্তন (Symbolic Thinking) :** এই স্তরে শিশু সংকেতের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সংকেতের মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে।

২) **আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন (Ego-centric Thinking) :** এই বয়সে শিশুর মধ্যে 'আমি' মনোভাব অধিক পরিমাণে কাজ করে এবং সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে সে নিজেকে প্রাধান্য দেয়।

৩) **সর্বপ্রাণবাদ (Animistic Thinking) :** আদি বাল্যকালের শিশু জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সে ভাবে সবকিছুর প্রাণ আছে।

প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) :

১) **শ্রেণিকরণ ক্ষমতা (Classification Ability) :** প্রান্তীয় বাল্যকালে শিশুর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তু বা বিষয়কে পৃথক করতে পারে।

২) **ক্রমপর্যায় ক্ষমতা (Periodic Ability) :** শিশু এই স্তরে ওজন বা উচ্চতার ভিত্তিতে ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট, ভারী থেকে হালকা, হালকা থেকে ভারী এই পর্যায়ে সাজাতে পারে।

৩) **আরোহী চিন্তন (Inductie Thinking) :** শিশু একই ধরনের অনেক বিষয়বস্তু দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে বা সামান্যীকরণ করতে পারে।

৪) **মূর্ত চিন্তন (Concrete Thinking) :** শিশুরা এই পর্যায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর ভাব শক্তি করতে পারে।

(ঘ) **সামাজিক বিকাশ (Social Development) :** এরিকসনের মত অনুযায়ী বাল্যকালের শিশুর সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য হলো—

১) তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের শিশুর মধ্যে উৎসাহ-অপরাধ বোধের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। শিশুরা কাজে সাফল্য পেলে উৎসাহ বেড়ে যায় এবং শেষ করতে না পারলে তারা

অপরাধবোধে ভোগে।

২) ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে শিশুর মধ্যে উদ্যম ও হীনমন্যতা তৈরি হয়। তারা প্রথাগত শিক্ষার আওতায় এসে নিজের কাজ করতে উদ্যোগী হয় ফলে তাদের কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয়। নতুবা তাদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়।

(ঙ) প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) :

আদি বাল্যকাল (Early Childhood) : এই বয়সে শিশুর মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মতো প্রায় সব ধরনের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় কিন্তু সেটি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা তৈরি হয় না।

প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) : এই বয়সে শিশুর অন্যদের প্রক্ষোভ বুঝতে সমর্থ হয় এবং শিশু প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৬.৪.২ বাল্যকালের বিকাশের মৌলিক চাহিদা (Fundamental Needs of Childhood) :

A. প্রারম্ভিক বাল্যকাল (Early Childhood) : সাধারণত দুই থেকে ছয় বছরের বয়সকালকে প্রারম্ভিক বাল্যকাল বলা হয়। এই স্তরে শিশুর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা অনুভূত হয় সেগুলি হল—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) : দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদাগুলি হল দৈহিক চাহিদা। এই চাহিদাগুলো সর্বজনীন ও সহজাত, যা শিশুর ওপর নির্ভর করে না। এই দৈহিক চাহিদাগুলি হল—

১) **খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :** দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির দরুণ শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদা দেখা যায়। বয়স যত বাড়তে থাকে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এমন অবস্থায় শিশু হাতের সামনে যা পায় তাই ভক্ষণ করার চেষ্টা করে।

২) **সক্রিয়তার চাহিদা (Demand for activism) :** সক্রিয়তা চাহিদার তাড়নায় শিশু সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক কাজ সম্পাদন করতে চায়। তারা বাবা-মায়ের কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় শিশুদের দায়িত্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হয়।

৩) **চলনের চাহিদা (Need for movement) :** প্রারম্ভিক বাল্যস্তরে শিশুর মধ্যে চলন এর চাহিদার তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। এরা কোথাও স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে না। দৌড়ানো, লাফানো, কোন কিছু টেনে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজে শিশু নিজেকে যুক্ত রাখতে চায়।

৪) **পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Need for repetition) :** এই প্রকার চাহিদার দরুণ শিশু একই রকমের কাজ বারবার সম্পন্ন করে। যেমন— কোন জিনিস শিশুকে দিলে তা ছুঁড়ে দেয়,

তা আবার দিলে আবার ছুড়ে দেয়। এর মাধ্যমে শিশু চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

(খ) **মানসিক চাহিদা (Mental Need) :** শিশুর বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই স্তরে এসে বিকশিত হয়। যেমন—যুক্তিশক্তি, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি। তবে এই আচরণগুলোর উদ্দেশ্যমুখী এবং বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত। চাহিদাগুলি হল—

১) **নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :** এই সময় শিশু সকলের কাছ থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। এই পর্যায়ে নিরাপত্তা বলতে প্রক্ষোভগত দিকের নিরাপত্তাকে বোঝানো হয়।

২) **অনুসন্ধানের চাহিদা (Need for Inquiry) :** এই স্তরে শিশুর মধ্যে অনুসন্ধানের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। এই চাহিদার জন্য বাল্যকালের শিশুরা যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়।

৩) **আয়ত্তে আনার চাহিদা (Need to control) :** জীবন বিকাশের এই স্তরে আয়ত্তে আনার চাহিদার একটু পরিবর্তন ঘটে। শিশুরা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাথে নিজেদের জিনিসগুলো নিয়ে খেলতে ভালোবাসে তবে তা খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(গ) **সামাজিক চাহিদা (Social Need) :** শিশুর সামাজিক বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার সামাজিক চাহিদাগুলি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং চাহিদাগুলো জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। চাহিদাগুলি হল—

১) **সহযোগিতার চাহিদা (Need for Cooperation) :** এই বয়সের শিশুদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা কেটে যায় বলে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধানে অগ্রসর হয়।

২) **সমবেদনার চাহিদা (Need for compassion) :** এই স্তরে শিশুর মধ্যে সমবেদনার চাহিদাটি শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। যেমন— শিশু স্কুলের টিফিন নিয়ে এলে বন্ধুদের সাথে ভাগ করে খায়।

৩) **প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা (Need for competition) :** প্রারম্ভিক বাল্যকালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা শৈশবের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। তবে একেবারে থাকে না তা নয়। নিজের সফলতা আনার প্রয়োজনে শিশুরা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে।

৪) **সমর্থনের চাহিদা (Need for support) :** এই সময় শিশুরা কোন কাজের জন্য বয়স্ক বা তার সমবয়সীদের সমর্থন বেশি প্রত্যাশা করে। বড়দের সমর্থন পেলে তারা কাজ করতে উৎসাহী হয়।

(ঘ) **নৈতিক চাহিদা (Ethical Need) :** বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিশুদের মধ্যে নীতিবোধ

জাগ্রত হয়। তারা এইসব নৈতিক শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনী পড়তে ও শুনতে ভালোবাসে। কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্বাস করে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুসারে প্রারম্ভিক বাল্যকালে শিশুদের প্রত্যেক আচরণের পেছনে তাদের বিচার বিবেচনা কাজ করে যে চাহিদাগুলি জীবন বিকাশের সহায়ক। সুতরাং, এই বয়সে শিশুদের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা যাবে এবং জীবনকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যাবে।

B. প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) : সাধারণত ছয় (৬) থেকে এগারো (১১) বছর বয়সকালকে প্রান্তীয় বাল্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই স্তরে শিশুর বিকাশের হার অব্যাহত থাকে। অনেক মনোবিদ এই স্তরকে ‘নকল পরিপক্কতার স্তর’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই স্তরের চাহিদাগুলি হল—

ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) :

১) **খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :** এই বয়সে শিশু পূর্ববর্তী খাদ্যের চাহিদার মতো বিক্ষিপ্ত আচরণ না করে বরং নিয়ন্ত্রিত আচরণ করে। ফলে খাদ্য পাওয়ার জন্য সে অনেক মার্জিত থাকে।

২) **চলনের চাহিদা (Need for movement) :** প্রান্তীয় বাল্যস্তরে শিশুর দৈহিক পরিণমন বেশি হওয়ার জন্য ব্যাপক ও বিস্তারিত পরিবেশে শিশু ঘোরাফেরা পছন্দ করে।

৩) **সক্রিয়তার চাহিদা (Need for activism) :** এই স্তরে সক্রিয়তা দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিশু এককভাবে কাজ করতে উৎসাহ না দেখালেও কোন কাজের দায়িত্ব পেলে সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ সক্রিয়তার চাহিদা দলগত চাহিদা নিবৃত হয়।

৪) **পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Demand for Repetition) :** এই স্তরের পুনরাবৃত্তির চাহিদা অনেকটাই হ্রাস পায়। কোন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিশুরা পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে। যেমন— কোন বিষয়ে পাঠ মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টা।

(খ) মানসিক চাহিদা (Mental Need) :

১) **আয়ত্তে আনার চেষ্টা (Need to control) :** প্রান্তীয় বাল্যে শিশুদের নিজস্ব আত্মনির্ভরশীলতার দরুণ সে অপরকে নিজের বশে রূপান্তরিত করতে চায়। যদিও এই চাহিদাটি পরবর্তীকালে আত্মনির্ভরতার চাহিদা থেকে সফলতার চাহিদায় পরিণত হয়।

২) **অভিজ্ঞতার চাহিদা (Need for Experience) :** এই বয়সে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে ভালোবাসে। কাজের দায়িত্ব পেলে খুশি হয় এবং পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের পরিচালনা করে।

৩) **নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :** শিশুরা এই সময়ে সহপাঠী বা বয়স্কদের কাছ থেকে প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। নিরাপত্তার চাহিদা তাদের অন্যান্য চাহিদাগুলি পূরণে সহায়তা করে।

৪) **অনুসন্ধানের চাহিদা (Need for Inquiry) :** অনুসন্ধানের প্রাথমিক চাহিদা প্রান্তীয় বাল্যে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। অজানা কোন বিষয় বা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য শিশুদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং অনুসন্ধানের চাহিদার মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

(গ) **সামাজিক চাহিদা (Social Need) :** সামাজিক চাহিদাগুলি প্রান্তীয় বাল্যে এসে আরো দৃঢ়তা লাভ করে।

১) **সমবেদনার চাহিদা (Need for Compassion) :** এই স্তরে কোন বন্ধু অসুবিধায় পড়লে শিশু তৎক্ষণাৎ সমবেদনা প্রকাশ করে এবং অসুবিধা দূর করার জন্য এগিয়ে আসে।

২) **দলভুক্তির চাহিদা (Demand for Team Membership) :** প্রান্তীয় বাল্যে শিশুরা তার পরিবারের বাইরেও দলভুক্তি থাকতে ভালোবাসে। এই চাহিদা সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩) **প্রতিদ্বন্দ্বীতার চাহিদা (Demand for Competition) :** শিশুরা এই সময় নিজেদের সফলতা আনার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যেমন— শ্রেণিতে প্রথম হওয়া।

(ঘ) **জ্ঞানের চাহিদা ((Need for Knowledge) :** এই চাহিদাটি পূর্ববর্তী স্তরের থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। চাহিদার তাড়নায় শিশু লেখাপড়া, গণনা করা ইত্যাদি কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে থাকে এবং কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে।

(ঙ) **পেশাগত চাহিদা (Need for Professional) :** এই স্তরে পিতা-মাতা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থেকেই তাদের পেশার প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ দেখা যায়।

(চ) **অনুকরণের চাহিদা (Need for Imitation) :** প্রান্তীয় বাল্যে শিশুরা অপরকে সম্মান করে, ভালোবাসে এবং তাদেরকে অনুকরণ করে ব্যক্তিগত সম্ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে চায়।

৬.৪.৩ বাল্যকালের বিকাশগত চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা (The Role of Parents and Schools in the Developmental Needs of Childhood) :

জীবন বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হলো বাল্যকাল। এই সময়কালে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদাগত পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই শিশু ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে

পরিবার তথা বিদ্যালয় শিশুর চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১) বাল্যকালের শিশুর দৈহিক বিকাশ ঘটে যেখানে পরিবার তথা বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে বিভিন্ন সক্রিয় কার্যাবলীর দ্বারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

২) শিশুদের নৈতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য বিদ্যালয় শিশুদের নীতি শিক্ষা দান করে।

৩) বাল্যকালে শিশুরা পরিবার ছেড়ে এক বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করে। সেই বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সঠিকভাবে মানিয়ে চলার জন্য পরিবার তথা বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪) শিশুদের এই সময় ব্যক্তিত্বের গঠন কার্য শুরু হয়। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা, শিক্ষকের সাথে সহপাঠীদের নানা কাজে অংশগ্রহণ ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে থাকে।

৫) এই বয়সের শিশুদের আত্মবিকাশের স্বাধীনতার দরকার হয় তাই বিভিন্ন সৃজনাত্মক কার্যাবলীর স্বাধীনতার দ্বারা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নানা প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।

৬) এই সময়ে শিশুদের মধ্যে নানা মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যার ফলস্বরূপ শিশু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে যেখানে পরিবার ও বিদ্যালয় শিশুকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

৬.৫ কৈশোরকাল (Adolescence)

৬.৫.১ কৈশোরকালের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য (Developmental Characteristics of Adolescence) :

ভূমিকা (Introduction) : শিক্ষাকাল অনুযায়ী তেরো (১৩) থেকে আঠারো (১৮) বা উনিশ (১৯) বছর পর্যন্ত বয়সকাল হলো কৈশোর। শিক্ষার্থীর জীবনে এই কালটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। Baron বলেছেন, “Period beginning with the onest of poverty and ending when individuals assume adult roles and responsibility.”

এই স্তরের বিকাশগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) : কৈশোরের দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হারে ঘটতে থাকে। এই বয়সে তাদের মধ্যে যৌন চেতনার বিকাশ ঘটে বা এই স্তরের শেষ পরিণতি লাভ করে। এই স্তরের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) উচ্চতা ও ওজন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

২) শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা এই বয়সে শক্তি প্রদর্শন করতে চায়।

৩) কোন কাজে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

৪) স্বরতন্ত্রের প্রসারণের ফলে গলার স্বর মোটা হয়।

৫) যৌন গ্রন্থির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং যৌনাঙ্গগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(খ) মানসিক/প্রজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য (Mental or Cognitive Characteristics) : দৈহিক বিকাশ এর মত এই স্তরে মানসিক বিকাশও অতি দ্রুত হয়। এই স্তরের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) **বিমূর্ত চিন্তন (Abstract Thinking) :** এই স্তরে এসে ব্যক্তি বিমূর্ত চিন্তন করতে সক্ষম হয়। যেমন— স্বাধীনতা, ভালোবাসা প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা করা।

২) **অবরোহ চিন্তন (Deductive Thinking) :** এই বয়সে শিশুরা সাধারণ (General) থেকে বিশেষ (Specific) বিষয়ে চিন্তা করতে পারে, একে অবরোহী চিন্তন বলে।

৩) **সমস্যা সমাধানের চিন্তন (Problem-Solving Thinking) :** এই স্তরে ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে।

৪) **প্রতিফলিত চিন্তন (Reflective Thinking) :** এই বয়সে ব্যক্তি নিজের চিন্তা বা যুক্তিকরণকে মূল্যায়ন করতে পারে, এই ধরনের চিন্তনকে বলা হয় প্রতিফলিত চিন্তন।

(গ) সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics) : কৈশোরের সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) **বন্ধুত্ব স্থাপন (Establishing friendships) :** এই বয়সে ব্যক্তির বন্ধুত্ব তৈরীর প্রবণতা দেখা যায়। কৈশোরে ব্যক্তি সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি করে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হতে ভালোবাসে।

২) **সামাজিক স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা (Attempts to gain social recognition) :** এই স্তরের ব্যক্তি সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। সেজন্য তার বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠান বা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চায়।

৩) **বন্ধু দলের প্রভাব বৃদ্ধি (Increasing the influence of friend group) :** এই স্তরের ছেলেমেয়েদের আত্মসংকট সৃষ্টি হয় বলে তারা বন্ধু দলের সঙ্গে বেশি সময় কাটায় এবং ওই দলের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য (Emotional Characteristics) : এই স্তরের প্রাক্ষোভিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) **প্রাক্ষোভিক অস্থায়িত্ব (Emotional instability) :** কৈশোরের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তির

প্রক্ষোভ সংবেদনশীল হয় এবং সে সহজেই দুঃখিত হয়। অর্থাৎ এই বয়সে প্রক্ষোভের স্থায়িত্বতা লাভ করে না।

২) **বিমূর্ত প্রক্ষোভ (Abstract emotion) :** ব্যক্তি কোন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে।

৩) **প্রাক্ষোভিক পরিণমন (Peripheral outcome) :** কৈশোরের শেষে ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ আসে।

৬.৫.২ কৈশোরের মৌলিক চাহিদা (Fundamental Needs of Adolescence) :

মানুষের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো কৈশোরকাল। যেহেতু এই স্তরে ছেলেমেয়েরা পরিপক্কতার স্তরে উন্নীত হয়, তাই অনেক সময় নতুন নতুন চাহিদার উদ্ভব হয়। কৈশোরকালের চাহিদাগুলো হলো—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) :

১) **খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :** কৈশোরকালের দৈহিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ অঙ্গানুনের ক্রিয়া এই সময় বেড়ে যায় ফলে খাদ্যের চাহিদা এই সময় প্রবল হয়।

২) **যৌন চাহিদা (Sexual Need) :** কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল যৌন চাহিদা। এই সময় যৌন গ্রন্থি এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, এই চাহিদার তাড়নায় তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

৩) **সক্রিয়তার চাহিদা (Demand for activism) :** এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সক্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের সক্রিয়তা থেকে তাদের মধ্যে স্বাধীন চেতনা বোধ জাগ্রত হয়।

(খ) মানসিক চাহিদা (Mental Need) :

১) **নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :** কৈশোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল নিরাপত্তার চাহিদা। এই সময় নানা চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা চাহিদা সৃষ্টি হয়।

২) **আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for Self-Expression) :** কৈশোরে ছেলেমেয়েরা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই রূপ মানসিকতার তাড়নায় তারা নিজেদের কে অন্যের সামনে প্রকাশ করতে চায়।

৩) **স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom) :** শৈশব থেকে শুরু করে ব্যক্তি পিতা-মাতা

ও অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু কৈশোরে এসে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

৪) **জ্ঞানের চাহিদা (Need for Knowledge) :** এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ হওয়ার দরুন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৌতূহল জন্মায়। এর ফলে জানার ইচ্ছা প্রবল হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিশ্বপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

(গ) সামাজিক চাহিদা (Social Need) :

১) **সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা (Need for social recognition) :** এই সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা দেখা যায়। তারা বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

২) **দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা (Demand of adventure) :** সাধারণত এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিহীন বিষয় মেনে না নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যার দরুন তাদের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) নৈতিক চাহিদা (Ethical Need) : এই সময় সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মানের ভিত্তিতে সমাজে সে তার নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করতে থাকে।

৬.৫.৩ কৈশোরের সমস্যাসমূহ (Problems of Adolescence) :

জীব বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে দৈহিক পরিবর্তন এবং হরমোন ক্ষরণ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এছাড়াও যুগের হাওয়া, সময়ের পরিবর্তন, পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা, যৌনবোধ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক চাপ ব্যক্তির জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিম্নে আলোচিত হলো—

(ক) যৌন সমস্যা (Sexual Problem) : যৌনগ্রন্থির বিকাশের ফলে এই সময় তাদের যৌন চেতনা ও যৌন চাহিদা বেড়ে যায়। এই চাহিদার তুলনায় তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন উপায় খোঁজার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিধি নিয়ম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে, এ কারণে তারা বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে।

(খ) স্বাধীনতার চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems due to the demand for independence): স্বাধীনতার চাহিদার কারণে এই সময় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। কিন্তু অভিভাবকদের বাধা দানে এই চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। ফলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হয়।

(গ) **নিরাপত্তা ও চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems due to security and demand) :** অভিভাবকদের আচরণে তারা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়। নিজেদের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। ফলে তারা নানারকম অপসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে, যেমন— বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া, মিথ্যে কথা বলা।

(ঘ) **জ্ঞানের চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems with the need for knowledges) :** এই সময় শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। তারা সমস্ত কিছু জানতে চায়। কিন্তু এই চাহিদার পরিতৃপ্তির না ঘটলে তাদের মধ্যে মানসিক উদ্বিগ্নতা দেখা যায়।

(ঙ) **আত্মপ্রকাশের চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems with the demand for self-expression) :** গৃহ পরিবেশ যথাযথ না হওয়ার কারণে অনেক সময় আত্মপ্রকাশের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না। স্বাধীনতার অভাব হেতু অনেক সময়ই তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যার ফলে তারা আড়ালে আবডালে অবাঞ্ছনীয় কাজকর্ম করে ফেলে।

(চ) **দুঃসাহসিক চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems due to adventurous demand) :** শিশুদের মধ্যে এই সময় নানা দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ফলে তারা কোন কিছু বিবেচনা না করেই অনেক সময় ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে নানা কাজ করে ফেলে যার প্রভাব তাদের সারাজীবন বহন করে চলতে হয়।

কৈশোরের এই সকল সমস্যা কোন না কোন চাহিদাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। দৈহিক, সামাজিক, মানসিক নানা চাহিদা শিক্ষার্থীকে আলোড়িত করে। তাই এই সময়কালকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা হয়।

৬.৫.৪ কৈশোরকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলার কারণ (Reason for calling Adolescence Stress and Stroms) :

ভূমিকা (Introduction) : কৈশোরে শিশুর দেহ ও মনে যে দ্রুত পরিবর্তন আসে, তা উল্লেখ করতে গিয়ে মনোবিদ স্ট্যানলি হল (Stanley Hall) তাঁর 'Adolescence' বইতে এই কালকে 'ঝড়-ঝঞ্ঝার' কাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে তার আচরণের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবেশের সঙ্গে এতদিনের সহজ সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে কৈশোরে সেই সম্পর্ক নতুন রূপে ও নতুন সমস্যা নিয়ে তার সামনে হাজির হয়। পুরাতনকে ভেঙে দিয়ে নতুন কিছু করার একটি তাড়না সে অনুভব করে। পূর্বের দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আসার জন্য সে নিজেকে অসহায় বলে ভাবতে শুরু করে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তার ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আবেগপ্রবণতা তাকে এই সময়ে গ্রাস করে ফেলে। তার মনে হয় যে, পরিবার বা সমাজ তার প্রাপ্য সম্মান বা মর্যাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে এবং একই সঙ্গে নিপীড়নমূলক মনোভাব প্রদর্শন করছে। ফলে সমাজের প্রচলিত প্রথা, অনুশাসন, রীতি-নীতি

ইত্যাদির প্রতি তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ আচরণ হল ভাবের ক্ষেত্রে এক নতুন উন্মাদনা।

কৈশোরে যে চিত্ত-বিক্ষোভ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় তা মূলত দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে দ্রুত পরিবর্তনের জন্যই সৃষ্টি হয়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তন তার জীবন পরিবেশে আলাদাভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং প্রক্ষোভগত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতি হিসাবে তাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকী নানাবিধ চাহিদা তার মধ্যে দেখা দেয়। সবসময় সে এক ধরনের অভাববোধ বা অতৃপ্তি অনুভব করে। আর এর স্বরূপ কখনোই তার কাছে বোধগম্য হয় না তার জন্য সে খেয়ালি, উদাসীন ও অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই সময়ে সে মনে করে যে পরিবেশের প্রতিকূলতার সাধে খাপ খাইয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ কল্পনা থেকেই হীনম্মন্যতাবোধ তার মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মাতে থাকে। এমতাবস্থায় তার মধ্যে দেখা দেয় আত্মস্বীকৃতি লাভের চাহিদা। কিন্তু সমাজ তার প্রতি ততটা মনোযোগী হয় না। তখন সে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে। এইরূপ মানসিক অবস্থার জন্য সমাজের প্রতি তার মধ্যে এক ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং সে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার ফলে যে সমস্ত সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেয়, তা হল—নেতিমূলক মনোভাব, নিপীড়নমূলক মনোভাব, আক্রমণধর্মিতা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কৈশোরের হঠাৎ দৈহিক পরিবর্তন তাদেরকে এইরূপ আচরণ সম্পন্ন করতে বাধ্য করে। আবার সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হল এই যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা, পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ, যৌন চেতনা ইত্যাদির মতো জটিল পরিস্থিতির আবর্তে সে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এছাড়া চাহিদা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে বাধাও তাকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ সম্পাদনে বাধ্য করে। এই সময়ে সে সমস্যার ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তাই এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বা ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা হয়।

কৈশোরের ঝড়-ঝাপটার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে গোচরে আনতে হবে।

১) আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধির ফলে আচরণগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বৈশিষ্ট্য মনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, ভাবপ্রবণ ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

২) দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ভাবাবেগও বৃদ্ধি পায়। একসময়ে সে নিজেকে শক্তিমান হিসাবে মনে করে। তার মনে হয়, যে কোনও কিছুই তার কাছে অসাধ্য নয়। আবার পরক্ষণেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কৈশোরকালে মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে নিজেকে অপাঙ্গতেয় হিসাবে মনে করে।

৩) কৈশোরের চিত্তবৃত্তির উদ্দীপনার জন্য সে কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। এর প্রভাবে সে আবেগতাড়িত

হয়ে কল্পলোকে বিচরণ করে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কল্পলোকে বিচরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপূর্ণ বাসনা পরিতৃপ্তির অভাবে সে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে।

৪) কৈশোরের যৌন চেতনা কৈশোরকালে এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যৌন চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সে তৎপর হয়ে ওঠে। যৌন চেতনা সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত মনোভাব সম্পূর্ণ বিরূপ অভিপ্রায় পোষণ করায় তার মনের মধ্যে নীতিবোধের ক্ষেত্রে এক প্রবল দ্বন্দ্বের করে। এর ফলে যে মানসিক বিক্ষোভ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা লক্ষ করে মনোবিদ্‌গণ এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বলে বর্ণনা করেছেন।

৬.৫.৫ কৈশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় এবং পরিবারের ভূমিকা (The role of school and family in solving various problems of adolescence) :

কৈশোরকালীন সমস্যাগুলির সমাধানে এবং উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদান সরবরাহে বিদ্যালয় এবং পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেমন—

(ক) সক্রিয়তার সঞ্চালন (Performance of activation) : বিদ্যালয়ে সক্রিয় কার্যাবলীর সঞ্চালন ঘটলে তার দরুন শিক্ষার্থীদের নানা চাহিদার ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান হবে। বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বা প্রতিযোগিতার আয়োজন দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজসাধ্য হয়।

(খ) জীবনধারণের প্রশিক্ষণ (Lifetime training) : বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলী ও জ্ঞানের প্রসার দ্বারা শিক্ষার্থীদের জীবনধারণের প্রশিক্ষণ দান করা যায়।

(গ) উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি (Creating the right environment) : বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ হল উপযুক্ত শান্ত পরিবেশ প্রদান করা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of holistic personality of students) : বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে নানান কাজে অংশগ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয়।

(ঙ) কিশোরদের সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান (Giving Adolescence the opportunity for full development) : বর্তমান শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক সুতরাং বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতি। এক্ষেত্রে পরিবার ও শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

(চ) ব্যক্তি বৈষম্য চিহ্নিতকরণ (Identifying individual inequalities) : প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর থেকে আলাদা, এই বিষয়টি পরিবার এবং বিদ্যালয়কে বুঝতে হবে। তাদের পৃথক

আগ্রহ চাহিদা বা সামর্থ্যকে চিহ্নিত করে তাদের বিকাশে সাহায্য করতে হবে।

(ছ) নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব (Responsibility for moral education) : শিক্ষার্থীদের নৈতিক গল্প বলে নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব পরিবার এবং বিদ্যালয়ের। এই নৈতিক শিক্ষার দরুন শিক্ষার্থীরা আচরণ গঠনের শিক্ষা লাভ করবে।

(জ) আত্মবিকাশের স্বাধীনতা (Freedom of self-development) : সৃজনাত্মক মন, আত্মবিকাশের স্বাধীনতা এবং কার্যাবলী স্বাধীনতার দ্বারা একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নানা প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে পরিবার ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(ঝ) ব্যবহারিক কার্যাবলীর সুযোগ (Opportunities for practical functions) : বিদ্যালয় এবং পরিবার বাস্তব পরিবেশের উন্মুক্ত ব্যবহারিক কার্যাবলীর সুযোগ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জগৎ ও জীবনের উপযোগী করে তুলবে।

উপরিউক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবার এবং বিদ্যালয় যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৈশোরকালীন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬.৬ সারাংশ (Summary)

বিকাশ (development) হল এক ধরনের পরিবর্তন যা জীবনের প্রথম (Conception) থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যপ্ত (extending) এবং যা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে (Orderly) হয়, যা নির্দিষ্ট স্তরভিত্তিক (progressive) এবং যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ী (consistent)। বিকাশের ফলে সাধিত পরিবর্তনগুলিকে সেভাবে পরিমাপ করা যায় না। এগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। মানুষের জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য আলাদা।

নীচে মানুষের জীবন বিকাশের স্তরবিন্যাস প্রদত্ত হল।

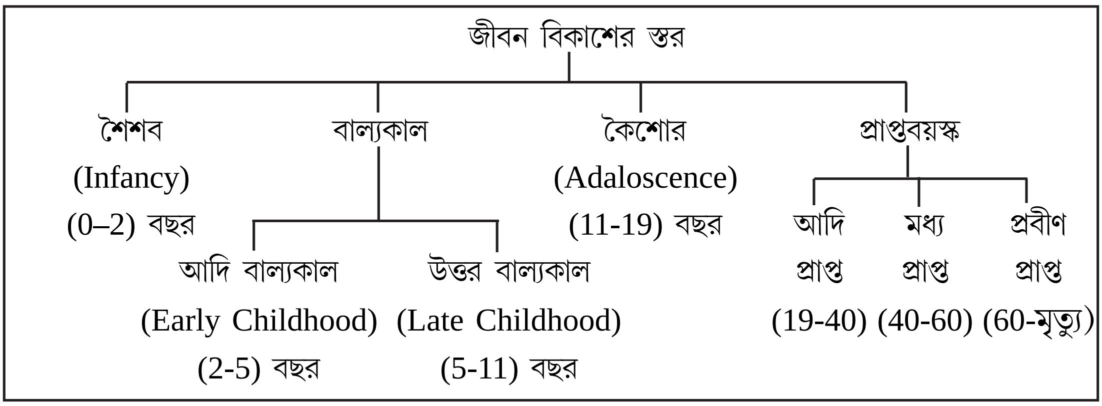

এই অধ্যায়ে শৈশব, বাল্যকাল ও কৈশোর তিনটি স্তরের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ও বিকাশগত চাহিদা পূরণে পিতামাতা এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মনোবিদ্‌গণ মানব বিকাশকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।

বিকাশ

দৈহিক সঞ্চালনমূলক মানসিক বৌদ্ধিক প্রাক্ষোভিক সামাজিক নৈতিক ভাষা ও বচন

আমরা এই ইউনিটে প্রতিটি স্তরে দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, ভাষাগত বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কতগুলি চাহিদা পরিলক্ষিত হয় যেমন— দৈহিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, প্রাক্ষোভিক চাহিদা, নৈতিক চাহিদা, জ্ঞানের চাহিদা ইত্যাদি। এই সমস্ত চাহিদাগুলি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এই সমস্ত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত না হলে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সম্পাদিত হয়। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য চাহিদাগুলি একান্তভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইসব চাহিদা পূরণে পিতামাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এই ইউনিটের শেষে শিক্ষার ওপর বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

৬.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. বিকাশ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

২. প্রজ্ঞামূলক বিকাশ বলতে কি বোঝেন?

৩. মানসিক বিকাশের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৪. কৈশোরের মৌলিক চাহিদাগুলি কি কি?

৫. কৈশোরকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলার কারণ কি?

৬. কৈশোরের সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা কি?

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing

House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

পর্যায়-৩

বিকাশের তত্ত্ব

(Theories of Development)

একক ৭ ❑ পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Piaget's Cognitive Development Theory)

গঠন **(Structure)**

৭.১ **উদ্দেশ্য (Objectives)**

৭.২ **ভূমিকা (Introduction)**

৭.৩ **পিয়াঁজে ও পিয়াঁজের তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ (Piaget and basic assumption of Piaget's Theory)**

৭.৪ **পিয়াঁজে প্রস্তাবিত জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরসমূহ (Piaget Suggested stages of Cognitive Development)**

৭.৫ **সমস্যা সমাধান করার চিন্তন (Problem Solving Thinking)**

৭.৫.১ **শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের অবদান, সীমাবদ্ধতা (Piaget's contribution in education and its limitations)**

৭.৫.২ **পিয়াঁজের তত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য (Educational Significance of Piaget's Theory)**

৭.৬ **সারাংশ (Summary)**

৭.৭ **স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Question)**

৭.৮ **গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)**

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যা শিখবে—

- পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ এর তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।
- প্রজ্ঞামূলক বিকাশ বলতে ধারণা জন্মাবে।
- ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে প্রজ্ঞার বিকাশের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারবে।
- স্কিমা, অভিযোজন, সাংগঠনিকীকরণ সম্বন্ধে ধারণা তৈরী হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি হবে।

৭.২ ভূমিকা (Introduction)

মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ হল শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞামূলক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক দক্ষতা এবং স্বাভাবিক জীবন কালের সময় কার্যকারিতার বিকাশ। Jean Piaget বিকাশের দুটি দিকের কথা বলেছেন— জ্ঞানমূলক বিকাশ (Cognitive Development) এবং অনুভুতিমূলক বিকাশ (Affective Development), পিয়াঁজের মতে জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বলতে সেই সব প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে, পিয়াঁজে মানুষের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিকাশকে জ্ঞানমূলক বিকাশের বিভিন্ন মাত্রা হিসেবে দেখেছেন। পিয়াঁজেঁ তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বে জেনেটিক এপিস্টেমোলছি (Genetic Epistemology) অর্থাৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিশুর জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পিয়াঁজের দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবিত। পিয়াঁজের জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী স্কিমা হল কোনো মুহূর্তে অর্জিত তথ্যসমূহের একক সংগঠন। স্কিমা সম্প্রসারণে দুটি প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি হল আত্তীকরণ (Assimilation) ও সহযোজন (Accommodation) পিয়াঁজে বলেছেন অভিযোজন হল আত্তীকরণ ও সহযোজনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি। এই অভিযোজনের পথেই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। পিয়াঁজে জ্ঞানমূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন—

1. সংবেদন সংযোজনমূলক চিন্তনের স্তর (Period of Sensorymotor Thinking)
2. প্রাক্-সক্রিয়তার স্তর (Period of Pre-operation)
3. নির্দিষ্ট সক্রিয়তার স্তর (Period of Concrete operation)
4. সংগঠিত সক্রিয়তার স্তর (Period of Formal operation)

আধুনিক মনোবিজ্ঞান পিয়াঁজের তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকের ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। পিয়াঁজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ—

1. শিক্ষামূলক প্রদীপনের ব্যবহার 2. সরল থেকে জটিল 3. কাজের মাধ্যমে শিক্ষা 4. সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম 5. শিক্ষণ মডেল, পিয়াঁজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে তা বাস্তবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সুযোগ, পরিবেশ ও শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহারের কথা বলেছেন।

৭.৩ পিয়াঁজে ও পিয়াঁজের তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ (Piaget and basic assumption of Piaget's Theory)

ভূমিকা (Introduction) : প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ Jean Piaget (1896) সালে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা এবং অবদান অবিস্মরণীয়। পিয়াঁজে মূলত একজন জৈব বিশারদ। এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রজ্ঞামূলক বিকাশে নতুন ধারণা প্রণয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পিয়াঁজে নিজেকে Generic Epistemologist হিসাবে মনে করতেন। ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে প্রজ্ঞার বিকাশের সম্পর্ক অনুসন্ধানে যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁদেরকে Generic Epistemologist বলা হয়। যুক্তি নির্ণয় অভীক্ষার প্রশ্নে শিক্ষার্থীর ভুল উত্তরের কারণ অনুসন্ধানে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনোযোগ বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আজীবন তিনি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ওপর গবেষণায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

পিয়াঁজের তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ (Basic Assumption of Piaget's Theory): বিভিন্ন বয়সের শিশুদের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করে পিয়াঁজে মন্তব্য করেন যে, প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তর আছে। প্রতিটি স্তরেই তার পূর্ববর্তী স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়। শিশুর প্রজ্ঞামূলক বিকাশের সূচনা হয়—স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত সংকেতের ব্যবহার এবং বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে পরিণত বয়স পর্যন্ত। এই সময় ব্যক্তি বিমূর্ত ধারণা এবং বিকল্প সম্ভাবনাগুলিকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় যার ফলে প্রজ্ঞার বিকাশ হতে থাকে। পিয়াঁজে তাঁর প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

স্কিমা (Schema): স্কিমার ধারণাটির উদ্ভাবক হলেন মনোবিজ্ঞানী Art Burlett (1932), স্কিমা হল কোনো মুহূর্তে অর্জিত তথ্যসমূহের একক সংগঠন। পরমুহূর্তে শিশু যখন নতুন তথ্য আয়ত্ত করে তার স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপী ব্যক্তির স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। স্কিমা সম্প্রসারণে দুটি প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়। যথা—অভিযোজন (Adaptation) এবং সাংগঠনিকীকরণ (Organisation)।

অভিযোজন (Adaptation): মানুষের এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের ওপর পিয়াঁজে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পিয়াঁজের মতে, অভিযোজন দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়। এই দুটি প্রক্রিয়া হল আত্তীকরণ (Assimilation) এবং সহযোজন (Accommodation)। আত্তীকরণ হল কোনো স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে নতুন তথ্য, চিন্তা-ধারণা বা ভাবের সংযোজন, যার ফলে স্কিমা পরিবর্তন তথা সম্প্রসারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে আমরা পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব পড়েছি। এই জ্ঞান ইতিমধ্যে অর্জিত জ্ঞানের যে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠন হয়েছে তার মধ্যে যুক্ত হয়ে স্কিমা সম্প্রসারিত হয়েছে। সহযোজন হল নতুন তথ্য, চিন্তা, ভাব ইত্যাদি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে স্কিমার মধ্যে যুক্ত করা। পরিবেশের নতুন তথ্য, চিন্তা বিষয় ইত্যাদি যদি বর্তমান স্কিমার পক্ষে সরাসরি গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য, চিন্তা বিষয় ইত্যাদিকে প্রয়োজন মতো পরিবর্তন বা বিন্যস্ত করে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে যুক্ত করা হয়, একেই সংযোজন বলে। যেমন—কঠিন কোনো ধারণা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় উদাহরণের সাহায্যে সহজে বুঝে নিতে পারি।

সাংগঠনিকীকরণ (Organisation): স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনসমূহ সংগঠিত হয়ে আরও জটিল চিন্তামূলক কাজ করতে সক্ষম হয়। একেই সাংগঠনিকীকরণ বলে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বই পাঠ করতে গেলে ঠিকমতো বই ধরতে হবে, পাতা উলটাতে হবে এবং চোখ সঞ্চালন করতে হবে।

এই তিনটি সংবেদন চালকমূলক প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করেই বই পড়ার কাজটি করা সম্ভব।

৭.৪ প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তরসমূহ (Stages of Cognitive Development)

Jean Piaget প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন—

প্রথম স্তর	সংবেদন-চালকমূলক স্তর (Sensori Motor Stage) জন্ম থেকে ১৮-২৪ মাস।
দ্বিতীয় স্তর	প্রাক্‌সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage) ২ বৎসর থেকে ৭ বৎসর।
তৃতীয় স্তর	মূর্ত-সক্রিয়তার স্তর (Concrete-operational Stage) ৭ বৎসর থেকে ১১ বৎসর।
চতুর্থ স্তর	যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operational Stage) ১১ বৎসর থেকে ১৮ বৎসর।

প্রথম স্তর: সংবেদন-সঞ্চালনমূলক স্তর (Sensorimotor stage):

শিশুর জন্ম থেকে প্রথম দু'বছর পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। এই সময়ে প্রজ্ঞার ক্রিয়াকলাপ সীমিত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১. **প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action):** জন্মমুহূর্তে শিশুর কিছু ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় এবং কিছু সাধারণ দৈহিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারে। কিছু নির্দিষ্ট প্রতিবর্ত ক্রিয়া তারা করতে পারে, যেমন—আঁকড়ে ধরা (Grasping), চোষা (Sucking) ইত্যাদি। যেহেতু শিশু জন্মের পর এই দুটি ক্রিয়া করতে পারে, তাই সে কোনো বস্তু হাতের সামনে পেলে সেটিকে আঁকড়ে ধরে মুখে দিয়ে চোষণ করতে শুরু করে। এই ধরনের আচরণ করতে করতে তার কোনো বস্তুর প্রতি ধারণা তৈরি হয়। তার সামনে চকলেট থাকলে যেমন সে সেটাকে মুখে দেবে, আবার সামনে লঙ্কা থাকলে সেটাকেও মুখে দিয়ে চুষতে শুরু করবে। লঙ্কা মুখে দেবার পর স্বাভাবিকভাবেই তার ঝাল লাগবে এবং পরবর্তীতে লঙ্কা সামনে দেখলে আর মুখে দেবে না। এইভাবে তার স্কিমার পরিবর্তন শুরু হয়।

২. **পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া (Circular action):** এই বয়সে শিশুরা কোনো একটি আচরণ একইভাবে বারে বারে করতে থাকে। এই ধরনের আচরণকেই বলে Circular action বা পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া তিন ধরনের হয়—

প্রথম শ্রেণির (১-৪) মাস: এখানে শিশু নিজের শরীরের কোনো অংশের সাথে এই পুনরাবৃত্তি করে থাকে, যেমন—আঙুল চোষা (thumb sucking)।

দ্বিতীয় শ্রেণির (৪-৮) মাস: এখানে শিশু বাইরের কোনো বস্তু নিয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে। যেমন—ঝুনঝুনি বাজানো (Shaking a rattle)।

তৃতীয় শ্রেণির (১২-১৮) মাস: এখানে শিশু চেষ্টা করে নতুন কিছু করার ও ফলস্বরূপ কী হচ্ছে

তা পর্যবেক্ষণ করার। যেমন ধরা যাক কোনো শিশুর হাত থেকে একদিন হঠাৎ খাবার সময় বাটি পড়ে যাওয়াতে শব্দ হল। এবার শিশুটি অন্য কিছু হাত থেকে ফেলে দিয়ে দেখতে চায় কী ধরনের শব্দ হচ্ছে।

৩. **বস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা (Object permanence):** শিশু জন্মের পরে কোনো কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে এটা বুঝতে পারে না। সে ভাবে, যা তার সামনে নেই তার অস্তিত্বও নেই। এই স্তরের শেষে সে বুঝতে শেখে কোনো কিছু তার চোখের সামনে না থাকলেও সেটি আছে। সেজন্য বাবা বা মা যখন তাকে বাড়িতে রেখে অন্যত্র যায়, তখন বাবা-মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ বুঝতে পারে কোনো কিছুর সস্থায়ী অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও সেটি তার সামনে নেই। এর ধারণাকে বলে Object permanence।

৪. **কল্পনাচ্ছলে খেলা (Make believe play):** এই স্তরে শিশুরা সারাদিনের কার্যকলাপকে কল্পনা করে খেলাচ্ছলে সেটিকে অভিনয় করে। একে বলে 'Make believe play'। যেমন, হাতে একটি খেলনা গাড়ি নিয়ে সোফার উপর দিয়ে নিয়ে যাবার সময় বলে গাড়িটি ব্রিজে উঠছে আবার ব্রিজ থেকে নামছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিশুরা এই স্তরের শেষে মানসিক-কল্প (Mental Representation) তৈরি করতে পারে এবং উদ্দেশ্যমুখী কিছু আচরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর: প্রাক্-ধারণামূলক স্তর (Pre-operational stage):

এই স্তরের বিস্তৃতি ২ থেকে ৭ বছর বয়স। এই স্তরে শিশু ধারণা গঠন করতে পারে এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তা করতে অসুবিধে হয়। এইজন্য এই স্তরকে প্রাক্-ধারণামূলক স্তর বলে। এই স্তরের প্রজ্ঞামূলক বৈশিষ্টা নীচে আলোচিত হল—

১. **সাংকেতিক চিন্তন (Symbolic thought):** এই বয়সে সংকেতের ব্যবহার করতে শেখে এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. **বিলম্বিত অনুকরণ (Deferred imitation):** এই স্তরে শিশুরা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করে কিছু সময় পরে সেটিকে অনুকরণ করে।

৩. **সর্বপ্রাণবাদ (Animistic thinking):** এই স্তরে শিশুরা জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তারা ভাবে পৃথিবীর সমস্ত কিছুরই প্রাণ রয়েছে। এই ধরনের চিন্তনকে বলে Animistic thinking বা সর্বপ্রাণবাদ চিন্তন।

৪. **আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন (Egocentric thinking):** এই স্তরে শিশুরা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি (Others viewpoint) বুঝতে পারে না। তারা ভাবে তারা যেভাবে কোনো কিছুকে বুঝছে বা দেখছে সবাই

একইভাবে সেটিকে দেখছে বা বুঝছে। এই ধরনের চিন্তনকে বলে Egocentric thinking বা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন। একটু খেয়াল করলে এই ঘটনা আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই।

৫. **একমুখী চিন্তন (Centration):** এই বয়সে শিশুরা একইসঙ্গে দুটি দিক দিয়ে কোনো বিষয়কে ভাবতে বা চিন্তা করতে পারে না। একে বলে Centration বা একমুখী চিন্তন।

উভমুখী চিন্তনের সীমাবদ্ধতা। আর এক ধরনের একমুখী চিন্তন এই বয়সে দেখা যায়, তা হল Irreversible thinking। এই বয়সে শিশু উভমুখী চিন্তন (reversible thinking) করতে পারে না।

উপরের দু'ধরনের (Centration & irreversible thinking) চিন্তনের ফলে এই বয়সে শিশুদের সংরক্ষণের নীতি (Principle of conservation) বোঝার ক্ষমতা আসে না। অর্থাৎ কোনো বস্তুর আকার পাল্টালেও বস্তুটি যে একই থাকে সেটা তারা বুঝতে পারে না।

এই বয়সে তারা বন্ধুদের সাথে একসাথে কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট কোনো খেলা খেলে। এই ধরনের খেলাকে বলে Sociodramatic play, যেমন—পুতুল খেলা।

তৃতীয় স্তর: মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete Operational stage):

এই স্তরে প্রথমেই পূর্বের স্তরের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর হয়। প্রথমত, তাদের Animistic thinking থাকে না অর্থাৎ জড় ও জীবকে পার্থক্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের Egocentric thinking দূরীভূত হয় অর্থাৎ তারা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি যে তার থেকে আলাদা হতে পারে সেটা বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, তাদের Centration দূর হয় অর্থাৎ একইসঙ্গে একের বেশি দিক (Dimension) দিয়ে ভাবতে পারে। চতুর্থত, তাদের চিন্তন উভমুখী (reversible) হয়। পঞ্চমত, তারা পদার্থের সংরক্ষণ নীতি বুঝতে পারে। এছাড়াও এই বয়সে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়—

A. শ্রেণিকরণ ক্ষমতা (Classification ability): এই স্তরে তারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে পৃথক করতে পারে ও নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করতে পারে। সেজন্য এই বয়সের শিশুরা Stamp, coin, card প্রভৃতি collection বা সংগ্রহ করতে ভালোবাসে। কোনো কোনো শিশু এই শ্রেণিকরণে অনেক সময়ও ব্যয় করে।

B. ক্রমপর্যায় ক্ষমতা (Seriation ability): ওজন বা উচ্চতার ভিত্তিতে এই বয়সের শিশুরা একাধিক বস্তুকে বড়ো থেকে ছোটো বা ভারী থেকে হালকা অথবা উল্টোভাবে সাজাতে পারে।

C. আরোহী চিন্তন (Inductive thinking): এই বয়সে শিশুদের মধ্যে আরোহী চিন্তন (Inductive thinking) ক্ষমতা তৈরি হয়। তারা একই ধরনের অনেক বিষয়বস্তু দেখে সামান্যীকরণে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। যেমন—বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখে তাদের পাখির ধারণা তৈরি হয়।

কিন্তু এই বয়সে শিশুদের বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking) ক্ষমতা ভালোভাবে গড়ে ওঠে

না, অর্থাৎ তাদের বিমূর্ত চিন্তনে অসুবিধে হয়। এই বয়সে মূর্ত চিন্তন (Concrete thinking) তাদের কাছে সহজ। এজন্যই এই স্তরকে মূর্ত ধারণামূলক স্তর বলে।

চতুর্থ স্তর: নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational stage):

পিয়াঁজের তত্ত্ব অনুসারে মানুষের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের এটিই শেষ ও সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ—

- বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking) ক্ষমতা তৈরি হয়।
- অবরোহী চিন্তন (Deductive thinking) করতে পারে।

মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণা (Concrete and Abstract concept): যে ধারণা মূর্ত বস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষণ করতে পারি সেগুলো হল মূর্ত ধারণা। যেমন—চেয়ার, টেবিল, বই, বাড়ি ইত্যাদি। এই ধারণার জন্য যে চিন্তন কাজ করে তাকে বলে মূর্ত চিন্তন (Concrete thinking)। কিন্তু সমস্ত ধারণা মূর্ত নয় যেমন-স্বাধীনতা (freedom), সততা (honesty), ভালোবাসা (love)। এই ধারণাগুলি কিন্তু মূর্তভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারি না—এগুলিকে বলে বিমূর্ত ধারণা। এই ধারণার জন্য চিন্তনকে বলে বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking)।

৭.৫ সমস্যা সমাধান করার চিন্তন (Problem solving thinking):

এই স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন ক্ষমতা হল—সমস্যা সমাধান করার চিন্তন (Problem solving thinking)। অর্থাৎ এই সময়ে কেউ সমস্যায় পড়লে সে একা একাই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে বা করার চেষ্টা করে। প্রথমে সে সমস্যাটিকে সংজ্ঞায়িত (define) করে। এরপর এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে তা চিন্তা করে (hypothesis formation)। এরপরে ওই hypothesis-কে পরীক্ষা করে দেখে যে, তার অনুমান ঠিক কিনা। এভাবে প্রথমবারে সমস্যার সমাধান না হলে পরে সে জন্য hypothesis গ্রহণ করে, আবার একইরকমভাবে পরীক্ষা করে সেটি ঠিক কিনা। এভাবেই সে সমস্যার সমাধান করে। নিম্নে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো—

সমস্যার সংজ্ঞায়ন

↓

সম্ভাব্য সমাধানের অনুমান

↓

সম্ভাব্য সমাধান এর জন্য পরীক্ষা

↓

সিদ্ধান্ত কারণ

৭.৫.১ শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের অবদান, সীমাবদ্ধতা (Piaget's contribution in education and its limitations)

অবদান (Contribution) :

i) শিশু সম্পর্কে যে বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত ছিল পিয়াঁজে তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি শিশুকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার বলেছেন এবং শিশুকে একই সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ii) শিশু আত্মপ্রচেষ্টার পরিবেশ থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তার জ্ঞানমূলক বিকাশে সহায়তা করে।

iii) পিয়াঁজে শিশুর জীবনবিকাশ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কারণ তিনিই প্রথম তাঁর প্রস্তাবিত বিকাশের স্তরগুলিতে শিশু কীভাবে প্রকৃতি থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা বর্ণনা করেছেন।

iv) পিয়াঁজে শিশুকে অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ করে বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি ছাড়াও যে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অনুশীলন করা যায়, এ কথা তিনি প্রমাণ করেন।

v) পিয়াঁজে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জীবনবিকাশ অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পরিবর্তন ঘটান।

vi) তিনি আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে চিকিৎসামূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতির (Clinical Interview) প্রবর্তন করেন।

vii) তিনি আধুনিক শিক্ষণ কৌশল হিসেবে যুক্তিনির্ভর গাণিতিক কৌশলের (Logico-mathematical technique) প্রবর্তন করেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitations):

i) পিয়াঁজে তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বে 'অপারেশনের' উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই 'অপারেশন' গুলির বিজ্ঞানসম্মত অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি। কাজেই কেবল 'অপারেশন' নামক একটা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা গড়ে তোলা ঠিক নয়।

ii) পিয়াঁজে তাঁর তত্ত্বে জীবনবিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সংগঠিত সক্রিয়তার স্তরের পরেও হয়। সুতরাং, পিয়াঁজে বর্ণিত জীবনবিকাশের স্তরগুলি সম্পূর্ণ নয়।

iii) পিয়াঁজে জ্ঞানমূলক সংগঠনের গুণগত দিকের কথা বললেও পরিমাণগত দিকের কথা কিছুই

বলেননি। সুতরাং, পিয়াঁজের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

iv) Gibson নানা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে, সংগঠিত সক্রিয়তার স্তরেও শিক্ষার্থীকে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দিলে তার ধারণা আরও সমৃদ্ধ ও দৃঢ় হয়। তাঁর মতে, 'We do not consive more when we persive less.'।

৭.৫.২ পিয়াঁজের তত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য (Educational Significance of Piaget's Theory)

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে, এ কথা অনেক মনোবিজ্ঞানীই বলেছেন। কিন্তু পিয়াঁজে সর্বপ্রথম চিন্তন জগতের বিকাশ কিভাবে সংগঠিত হয়, সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বে। তিনিই প্রথম বলেন যে, মানসিক পুষ্টি ও সমৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকাশ একটি আনুপাতিক গাণিতিক এবং বিশ্লেষণাত্মক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়সে মানসিক পুষ্টিও নির্দিষ্ট। সুতরাং, শিশু বিকাশের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্নভাবে সমস্যার সমাধান করে থাকে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল শিশুর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এবং শিশু যাতে যুক্তির দ্বারা সমস্যাসমাধান করতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা। পিয়াঁজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের নীতি নির্ধারণে নানাদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষার প্রগতিশীল আদর্শকে কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করেছে। পিঁয়াজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ—

শিক্ষামূলক প্রদীপনের ব্যবহার (Use of Teaching Aids): পিয়াঁজে বলেছেন, প্রত্যক্ষণ যদি অর্থপূর্ণ হয়, তবেই ধারণা সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং, শিখন প্রক্রিয়ার শুরুতেই শিশুকে বিভিন্ন রকম প্রদীপন ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে হবে। যে-কোনো বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিভূমি হল কোনো-না-কোনো মূর্ত বস্তুর উপস্থাপনা। তাই শিক্ষক পাঠদানের সময় যেমন মূর্ত বস্তু উপস্থাপন করবেন, তেমনভাবেই একই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনধর্মী, চেনা-পরিচিত উদাহরণ উপস্থিত করবেন।

সরল থেকে জটিল ধারণা (Simple to Complex concept): শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরের কথা মনে রেখে পাঠদান করবেন। তাই পাঠদানের শুরুতে কোনো বিষয়ে প্রবেশের মুহূর্তে তিনি কোনো জটিল ধারণার আশ্রয় নেবেন না। তাহলে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষক তাই সরল ধারণা দিয়ে শুরু করবেন এবং ক্রমশ তার স্তর উন্নয়ন ঘটিয়ে, জটিল ধারণার দিকে নিয়ে যাবেন। তবেই শিক্ষার্থীর মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সুষ্ঠু শিখনের ফলে মনন ও চিন্তন জগৎ সমৃদ্ধ হবে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through Activity): শিক্ষককে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র চার দেয়ালের ঘেরাটোপে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ রেখে শিখন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। সে শুধু বই পড়েই নয়, দেখেশুনে, নেড়েচেড়ে ও পরীক্ষার

মাধ্যমেও কিছু শিখবে এবং যাচাই করে নেবে। তাই শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক নিদর্শন, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি, বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়া যায়।

সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম (Consistent curriculum): শিক্ষক শিশুর শিখনকে কার্যকরী করে তোলার জন্য তার জীবনবিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম নির্বাচন করবেন। কারণ প্রত্যেক স্তরের বৌদ্ধিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাস ঘটাতে না পারলে শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। পিয়াঁজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষায় পাঠক্রম নির্ধারণের নীতি নির্বাচনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

শিক্ষণ মডেল (Teaching Model): পিয়াঁজে তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়া, যেমন—সহযোজন, আত্তীকরণ ইত্যাদির কথা বলেছেন, যেগুলি শিশুকে সক্রিয় করে উঠতে সাহায্য করে। এই নীতিকে প্রয়োগ করে বর্তমানে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষণের অনেক ‘শিক্ষণ মডেল’ তৈরি হয়েছে। এই ‘শিক্ষণ মডেল’গুলি শিক্ষককে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদেরও উৎসাহী করে তোলে। তারা সক্রিয়ভাবে এই বিষয়গুলি শিখনে অংশগ্রহণ করে।

মন্তব্য (Conclusion): পিয়াঁজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে, তা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তাই পিয়াঁজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মানুষের জ্ঞানমূলক বিকাশ কীভাবে হয় তা বিশদ আলোচনার কথা বলেছেন এবা এই জ্ঞানকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ, পরিবেশ ও শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহারের কথা বলেছেন।

৭.৬ সারাংশ (Summary)

এই ইউনিটে পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ এর তত্ত্ব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিয়াঁজের ১৮০০ এর দশকের শেষের দিকে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন গুণী ছাত্র ছিলেন, যখন তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তখনই তিনি নিজের পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আলফ্রেন্ড বিঁনে ও সাইমনের সঙ্গে কাজ করাকালীন তিনি তাঁর প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। পিয়াঁজে শিক্ষাতত্ত্ব ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা এই ইউনিটে আলোচিত হয়েছে।

৭.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব অনুযায়ী স্কিমা কি?

২. পিয়াঁজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তরগুলি কি কি?

৩. শিক্ষায় পিয়াঁজের তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. পিয়াঁজের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করুন।

৫. সমস্যা সমাধান করার চিন্তন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ৮ ❑ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব (Erikson's Psycho-Social Development Theory)

গঠন (Structure)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ ভূমিকা (Introduction)

৮.৩ মনো-সামাজিক বিকাশ (Psycho-Social Development)

৮.৩.১ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Erikson's Theory of Psycho-Social Development)

৮.৩.২ বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Discussion of Development Process)

৮.৪ এরিকসনের প্রস্তাবিত মনো-সামাজিক জীবন বিকাশের স্তর (Stages of Erikson Psycho-social Development)

৮.৫ এরিকসনের তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Erikson's Theory), এরিকসনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য Educational Significance of Erikson's Theory)

৮.৫.১ এরিকসনের তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Erikson's Theory)

৮.৫.২ এরিকসনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য Educational Significance of Erikson's Theory)

৮.৬ সারাংশ (Summary)

৮.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Question)

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যা শিখবে—

- এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা তৈরী হবে।
- এরিকসনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ হবে।
- এরিকসনের তত্ত্বের মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবগত হবে।

- এরিকসনের মনোসামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা হবে
- এরিকসনের মনোসামাজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবগত হবে।

৮.২ ভূমিকা (Introduction)

মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ হল শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞামূলক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক দক্ষতা এবং স্বাভাবিক জীবন কালের সময় কার্যকারিতার বিকাশ। এটি বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান নামে পরিচিত শৃংখলার বিষয়বস্তু। ঐতিহ্যগতভাবে শিশু মনোবিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রায় বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শৈশব এবং প্রাপ্তবয়স্ক তাও এর বিকাশের পর্যায়গুলি সম্পর্কে অনেককিছু শেখা হয়েছে। শিক্ষাগত অধ্যয়নে মানুষ কিভাবে শেখে, পরিপক্ক হয় এবং মানিয়ে নেয় তা বোঝার জন্য বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানের অধ্যয়ন অপরিহার্য। শিক্ষাবিদরা মানুষকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছতে সাহায্য করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করেন। বিকাশমূলক তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরিকসনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনা করা হল। এরিকসন জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে ঈদ (ID) এর অতিযৌনতার ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাই তার তত্ত্বকে মনোসামাজিক তত্ত্ব (Psycho-Social Theory) বলা হয়। এরিকসন ব্যক্তি জীবনের বিকাশের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এরিকসন প্রস্তাবিত মনোসামাজিক জীবন বিকাশের স্তরগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এরিকসনের তত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর তত্ত্বের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এছাড়া তার তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য অপরিসীম।

৮.৩ মনো-সামাজিক বিকাশ (Psycho-Social Development)

মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন এরিক এরিকসন (Erik Erikson)। তিনি ফ্রয়েডের ছাত্র হওয়ায় ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দ্বারা প্রথমদিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি ফ্রয়েডের মনোসমীকরণবাদকে আরও বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের কিছু কিছু নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে ঈদ (ID)-এর অতি যৌনতার ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে মনো-সামাজিক তত্ত্ব (Psycho-social Theory) বলা হয়।

৮.৩.১ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Erikson’s Theory of Psycho-Social Development)

ফ্রয়েড বলেছিলেন—জন্মাবস্থায় মানুষের অবচেতন মনে ইদ (Id) অবস্থান করে। এই ইদ থেকেই মানুষের সমস্ত আচরণ এবং ইগো (Ego) সৃষ্টি হয়। এই ইদ্, ইগো এবং সুপার ইগোর (super ego) দ্বন্দ্বের ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এরিকসনের মতে—

- জন্মাবস্থায় মানুষের মধ্যে ইগো বর্তমান থাকে এবং ইদ-এর প্রভাব ছাড়াই তা স্বাধীনভাবে অবস্থান করে, সুতরাং, ইগো একটি স্বাধীন সত্ত্বা।
- ইগো (Ego) যেহেতু ইদ (Id)-এর শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, তাই ইদ এবং ইগোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। অর্থাৎ ইগো জন্মাবস্থা থেকেই দ্বন্দ্বমুক্ত অবস্থায় থাকে।
- সামাজিক পরিবেশে অভিযোজনের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ হল ইগোর বিকাশ। সুতরাং, ইগোর বিকাশের মৌলিক উপাদান হল সমাজ।
- সুতরাং, ইগো বিকাশের মূল কারণ হল মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব, যৌনশক্তির দ্বন্দ্ব নয়।
- ইগোর বিকাশে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়।
- ইগোর বিকাশে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় তা জন্মগত এবং শক্তিও অন্ত্যজ।
- এই ইগোর বিকাশের ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে।

৮.৩.২ বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Discussion on Development Process) :

ফ্রয়েড তাঁর মনোসমীক্ষণ তত্ত্বে 'লিবিডো'-কেই আত্মগত শক্তির মূল উৎস বলেছেন। সেই কারণে লিবিডোকে তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তির ইগো কীভাবে বিকশিত হয় তা ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু এরিকসন তাঁর তত্ত্বে ইগো বিকাশের মাধ্যমে কভিাবে ব্যক্তিজীবনে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করেছেন।

i) ইগো ব্যক্তিকে অভিযোজনে সহায়তা করে। বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ইগো।

ii) ইগো, ইদ ও সুপার ইগোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। ইদের চরম জৈবিক চাহিদা এবং সুপার ইগোর চরম নৈতিক চাহিদার মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় রাখে ইগো।

iii) এই সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য ইগো বাস্তব পরিস্থিতি, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আনুষঙ্গিক পটভূমি ইত্যাদি বিচার করে, ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের আচরণ করবে তার প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই কাজ করার জন্য ইগো প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কৌশল (Defence Mechanism) অবলম্বন করে।

iv) ব্যক্তির ইগো যখন বাহ্যিক জগতের সংস্পর্শে আসে তখনই বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ইগোর সংঘাত ঘটে এবং ব্যক্তি সেই সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। প্রত্যেক পরিস্থিতি ইগোর কাছে নতুন। সাধারণত একইরকম পরিস্থিতি দ্বিতীয়বার আসে না। যদি কোনো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি

হয়, তাহলে সেই পরিস্থিতি পূর্ব পরিচিতির প্রভাবেই বদলে যায়। অর্থাৎ একবার ইগোর যে সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়, তা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যায় না। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে ইগোর বিকাশ ঘটে।

v) ব্যক্তির ইগোর বিকাশ পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী উর্ধ্ব ক্রমানুসারে পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ (Increasing Differentiation and Specilization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে।

vi) ব্যক্তির জীবনবিকাশ তার জন্মগতভাবে প্রাপ্ত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা ব্যক্তি তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে। এর ফলে তার ইগোর বিস্তৃতি ঘটে, নিত্যনতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম হয়।

vii) যখন ব্যক্তির ইগোর চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় মনোসামাজিক দ্বন্দ্ব, যা ব্যক্তিকে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে। এই বিরোধকে এরিকসন বলেছেন সংকটকাল (Crisis)।

viii) এই সংকটের উৎস দুটি। একটি ব্যক্তি নিজে এবং অপরটি হল একটি সামাজিক বাধা যার সৃষ্টি সমাজ থেকে। ব্যক্তি এই সংকটমূলক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অভিযোজন করে এবং এর ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে।

ix) জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই সংকটগুলি বিভিন্ন রকম হয়। ব্যক্তি বিভিন্ন স্তরে কীভাবে এই সংকটগুলির মোকাবিলা করে তার উপরই নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে। ব্যক্তির আচরণে এর প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দু-প্রকারই হতে পারে।

x) এরিকসন এই জাতীয় আটটি সংকটের কথা বলেছেন এবং এই সংকটগুলিকে জীবনবিকাশের এক-একটি স্তর হিসেবে বর্ণনা করে ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনে। কীভাবে মনো-সামাজিক বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করেছেন।

৮.৪ এরিকসন প্রস্তাবিত মনো-সামাজিক জীবনবিকাশের স্তর (Stages of Eriksons Psycho-social Development)

এরিকসন প্রস্তাবিত মনোসামাজিক জীবনবিকাশের স্তরগুলি হল—

স্তর (Stage)	**জীবন বিকাশের স্তর (Phycho Social Development)**
প্রথম স্তর	বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব (Trust vs Mistrust) ০-১/২ বছর।
দ্বিতীয় স্তর	স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব (Autonomys vs Shame and Doubt) ১১ মাস থেকে ২/৩ বছর।

তৃতীয় স্তর	উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব (Initiatives vs Guilt) ৩-১২ বছর।
চতুর্থ স্তর	উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব (Industry vs Inferiority) ৬-১২ বছর।
পঞ্চম স্তর	আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব (Identity vs Identity Confusion) ১২-২০ বছর।
ষষ্ঠ স্তর	হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব (Intimancy vs Isolation) ২০-৪৫ বছর।
সপ্তম স্তর	অগ্রমুখিতা ও স্থবিরতার দ্বন্দ্ব (Gene rativity vs Stagnation) ৪৫-৬৫ বছর।
অষ্টম স্তর	সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব (Integrity vs Despair) ৬৫ বছরে ঊর্ধ্বে।

i) **প্রথম স্তর (First Stage) : বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব 0-1/2 বছর (Trust vs Mistrust):** জন্মের পর দেড় বছর বয়স পর্যন্ত শিশু যে মনো-সামাজিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তা হল বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা আস্থা-অনাস্থা। স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এই সময় শিশুর পারিপার্শ্বিকের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন প্রয়োজন। এই সময় শিশু তার চাহিদা পূরণের জন্য সম্পূর্ণভাবে পিতামাতা বা পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের উপর নির্ভর করে। পিতামাতার যত্ন এবং তাদের সঙ্গে বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক শিশুকে তাদের উপর আস্থা অর্জনে সাহায্য করে। অপরদিকে পিতামাতার অবহেলা শিশুর অনাস্থা ও অবিশ্বাসের কারণ হয়, যা পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ii) **দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব : 1/2-3 বছর (Autonomy's vs Shame and Doubt) :** এই স্তরে শিশুদের মধ্যে যে মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল স্বাধীনতা এবং লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব। এই বয়সের শিশুকে প্রাত-কৃত্য সম্পন্ন করা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সময় শিশুর মধ্যে এই জাতীয় কাজ নিজে নিজে করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু অভিভাবকদের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর মধ্যে লজ্জা, সন্দেহ দেখা দেয়। অভিভাবকদের এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যদি শিশুর প্রতি কোনোরূপ অবহেলা প্রকাশ না পায় তাহলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ এমন হবে যাতে শিশুর স্বাধীনতা কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়।

iii) **তৃতীয় স্তর (Third Stage) : উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব : 3-6 বছর (Initiative vs Guilt) :** এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন উদ্যোগ ও অপরাধের দ্বন্দ্ব। এই সময় শিশুরা শারীরিক দিক থেকে অনেক পারদর্শী হয়ে ওঠে। ফলে তারা চলাফেরায় অনেক স্বাধীনতা অর্জন করে। ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় কল্পনার বিকাশ ঘটে। এই সময় শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেখা যায়। এই উদ্যোগী মানসিকতার জন্য তারা বিভিন্ন কাজ, যেমন— পড়া, লেখা,

ছবি আঁকা, বিদ্যালয়ে যাওয়া, নিজে নিজে পোশাক-পরিচ্ছদ পরা ইত্যাদি করতে পারে। এই সময় খেলার ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে শিশুর মধ্যে 'সুপার ইগো' (Super Ego) গঠিত হয় এবং সে নৈতিক বিভেদ বোঝে, ফলে সামাজিক বিধিনিষেধ অমান্য করলে তাদের মধ্যে পাপবোধও দেখা দেয়।

iv) **চতুর্থ স্তর (Forth Stage) : উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব : 6-12 বছর (Industry vs Inferiority) :** এই স্তরে শিশুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব। এই সময় শিশু কোনো কাজ করে তার স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। কোনো কাজে সফল হয়ে স্বীকৃতি পেলে তারা উদ্দীপিত হয়। অপরদিকে কোনো কাজে অসফল হলে এবং স্বীকৃতি না পেলে সে হীনম্মন্যতায় ভোগে। এই কারণে এই স্তরে শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিতে হবে যাতে সে সেই কাজে সফল হয়। কারণ সামান্যতম সাফল্যও শিশুকে অভিযোজনে সাহায্য করে।

v) **পঞ্চম স্তর (Fifth Stage) : আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব : 12-20 বছর (Identity vs Identity Confusion) :** মনোসামাজিক তত্ত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই স্তরে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির সংকট। এই সময়ে বাল্যকাল শেষ হয়ে শিশু কৈশোরে প্রবেশ করে। প্রারম্ভিক কৈশোর হঠাৎ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে কিশোরদের নিজের সম্পর্কেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সে কী করবে বুঝতে পারে না। আবার এই সময় কিশোররা অন্যের চোখে নিজে কেমন তা দেখতে চেষ্টা করে, আত্মমূল্যায়ন করে এবং নিজেকে প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল্য ভাবতে শুরু করে। একেই এরিকসন বলেছেন আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব।

vi) **ষষ্ঠ স্তর (Sixth Stage) : হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব : 20-45 বছর (Intimacy vs Isolation) :** এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব। বয়সের দিক থেকে এই সময়কাল হল প্রারম্ভিক যৌবনের স্তর। এই সময় দলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই সময় বন্ধুদের প্রতি যে হৃদ্যতা প্রকাশ পায় তা অনুভূতিপ্রবণ। আবার এই স্তরে অন্যের সামাজিক আচরণ অনুকরণ করে দলগত মনোভাবের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। এই সময় অন্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে এদের মধ্যে একাকিত্ব বোধ দেখা দেয় এবং কারও প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে না।

vii) **সপ্তম স্তর (Seventh Stage) : অগ্রমুখিতা ও স্থবিরতার দ্বন্দ্ব : 45-65 বছর (Generativity vs Stagnation) :** মধ্যবয়সে ব্যক্তি নিজের সন্তান ও সমাজের কীভাবে উন্নতি হবে সেই চেষ্টা করে। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যাতে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয় তার ব্যবস্থা করে। একেই এরিকসন বলেছেন অগ্রমুখিতা। কোনো কারণে এই কাজে ব্যর্থ হলে সেইসব ব্যক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। তারা নিজের মঙ্গল ছাড়া অন্য কারও মঙ্গলের কথা ভাবতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে

স্থবিরতা (Stagnation) আসে।

viii) অষ্টম স্তর (Eight Stage) : সামঞ্জস্যতাপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব : 65 বছরের উর্ধ্বে (Ego integrity vs Despair) : মনো-সামাজিক বিকাশের এই স্তর হল বার্ধক্যের স্তর। এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব। যে সমস্ত ব্যক্তি পূর্ববর্তী স্তরগুলির দ্বন্দ্বগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন তাঁরা এই সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাঁরা জীবনকে আনন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। জীবনের ওঠাপড়া, লাভক্ষতিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতিচারণ করেন তখন তৃপ্তি বোধ করেন এবং নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ইতিবাচক অর্থ খুঁজে পান। অপরদিকে, যাঁরা পূর্ববর্তী বিকাশের স্তরগুলিতে সংকটগুলির সঙ্গে উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। জীবন সম্পর্কে তাঁদের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। বার্ধক্য, ব্যর্থতা এবং সুযোগের অপচয় বোধ থেকে প্রচণ্ড মৃত্যুভয় গড়ে ওঠে।

৮.৫ এরিকসন তত্ত্বের মূল্যায়ন ও শিক্ষাগত তাৎপর্য (Evaluation of Erikson's Theory and Educational Significance)

৮.৫.১ এরিকসনের তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Erikson's Theory)

i) এরিকসনের তত্ত্বে জীবনবিকাশকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে।

ii) এই তত্ত্বে ইগোকে দ্বন্দ্বমুক্ত স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে জীবনবিকাশকে মানসিক সুস্থতার দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

iii) এই তত্ত্বে জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে লিবিডোর অত্যধিক যৌনতাকে গুরুত্ব না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

iv) জীবনবিকাশের অন্যান্য তত্ত্বগুলিতে কৈশোরকাল পর্যন্তই বিকাশকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এরিকসন তাঁর তত্ত্বে বিকাশকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে বিভিন্ন সংকটের সমাধানের মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitations):

i) মনো-সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ বিকাশ ঘটে, তা এরিকসন তাঁর তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেননি।

ii) পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, এরিকসন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে স্তরগুলির কথা বলেছেন তা সবার ক্ষেত্রে ওই একই ক্রম অনুসরণ করে না।

iii) এরিকসন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিতে যে দ্বন্দ্বগুলির উল্লেখ করেছেন যদি কোন কারণে কোনো স্তরে দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বিকাশের রূপ কেমন হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

iv) এরিকসনের তত্ত্বে অনেক অভিনবত্ব ও সম্ভাবনা থাকলেও এর দ্বারা ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সমস্ত দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৮.৫.২ এরিকসনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Erikson's Theory)

এরিকসনের মতে, মনো-সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি ব্যক্তির জীবনে পর্যায়ক্রমে ঘটে এবং একটি স্তরের সংকট কাটিয়ে ওঠার পরই ব্যক্তি তার পরবর্তী স্তরের সংকটগুলির অভিযোজনে প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকটি স্তরে অভিযোজনে তাকে সাহায্য করে শিক্ষা। তাই তিনি প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম স্তর, যেহেতু বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা আস্থা-অনাস্থার দ্বন্দ্বের স্তর, তাই এই স্তরে শিশুর নিরাপত্তা যাতে কোনো কারণেই বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। তারা যেন কোনোভাবেই অবহেলিত না হয় সে বিষয়েও সচেতনতার প্রয়োজন। পিতামাতা বা শিক্ষকের আচরণে যাতে শিশুরা বিভ্রান্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। শিশুর কোনো আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিশু দৈহিক বা মানসিকভাবে অবহেলিত বোধ না করে।

দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্বের স্তরে শিশুদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তাদের স্বাধীনতা কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। এই স্তরে তাদের এমন কাজ দিতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আদর্শ চরিত্র গঠন করতে পারে। এই বয়সের শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয় হয় তাই পিতামাতা ও শিক্ষকের আচরণ হতে হবে আদর্শস্থানীয়।

তৃতীয় স্তর, যেহেতু উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্বের স্তর তাই এই স্তরে খেলার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খেলা শিশুর উদ্যোগী মনোভাবকে উৎসাহিত করে এবং আনন্দদান করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু জ্ঞান অর্জন করে, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখে, প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে, সামাজিক বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে পারে। সুতরাং এই স্তরে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত শিখনের প্রবণতাকে ভিত্তি করে পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা করতে হবে। পাঠক্রমের পাশাপাশি খেলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা মানসিক ও দৈহিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাহলেই তারা আর অপরাধপ্রবণ হয়ে জীবনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যাবে না।

চতুর্থ স্তর, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্তরটি হল উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্বের স্তর। এই স্তরের প্রথম দিকে শিশুরা যে ক্ষমতা বা দক্ষতা অর্জন করে তার ব্যবহারের খুব আগ্রহ বোধ করে। এই আগ্রহের ফলেই তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। কাজেই এই স্তরে শিক্ষক শিশুর প্রতিভাকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে সে তার নিজের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে। শিশু যদি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পারদর্শিতা দেখাতে পারে তাহলেই তার মধ্যে কর্মক্ষমতা গড়ে উঠবে।

পঞ্চম স্তর, অর্থাৎ কৈশোরকাল হল আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্বের স্তর। এই স্তরের শিক্ষায় সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বয়স্কদের মতোই আচরণ করতে হবে এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদা দিতে হবে। এই স্তরের পাঠক্রম এমন হবে যা তাদের বাস্তব লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করবে, ভবিষ্যতে বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। বিষয়গুলি চ্যালেঞ্জিং হলেও তা তাদের ক্ষমতার বাইরে হবে না। তাই এই স্তরে শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিতর্কসভা, আলোচনা সভা এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন। তাহলেই কিশোর-কিশোরীরা তাদের আত্মপরিচয় খুঁজে পাবে এবং পরিচয় বিভ্রান্তির জন্য অসামাজিক পথে প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্য নেবে না।

৮.৬ সারাংশ (Summary)

মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন এরিক এরিকসন (Erik Erikson), সমগ্র মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে কেন্দ্র করে তাঁর এই তত্ত্বের অবতারণা। তিনি ফ্রয়েডের ছাত্র হওয়ায় ফ্রয়েডের মনঃ সমীক্ষা তত্ত্বের দ্বারা প্রথমদিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে ঈদ (Id) এর অতি যৌনতার ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে মনো-সামাজিক তত্ত্ব (Psycho-Social Theory) বলা হয়।

এরিকএরিকসন (১৯০২-১৯৯৪) ছিলেন একজন মনস্তাত্ত্বিক যিনি ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করে বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে মনো-সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

এরিকসন শৈশব থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আটটি সংকট বা সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি ব্যক্তির মনঃসামাজিক বিকাশের আটটি পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ইউনিটে প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরিকসন তত্ত্বের মূল্যায়ন ও সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে।

৮.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. এরিকসনের মনোসামাজিক তত্ত্বে মানবজীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করুন।

২. এরিকসনের মনোসামাজিক তত্ত্বে মানব জীবনের বিকাশের স্তরগুলির শিক্ষাগত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।

৩. এরিকসনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪. Id, Ego এবং Super ego নিয়ে এরিকসনের মতবাদ কি?

৫. এরিকসন তাঁর তত্ত্বে ইগো বিকাশের মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তিজীবনে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তার বর্ণনা দিন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

একক ৯ ❑ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Moral Developmental Theory)

গঠন **(Structure)**

৯.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৯.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৯.৩ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ও বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা

৯.৩.১ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব **(Kohlberg's Theory of Moral Development**

৯.৩.২ বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা **(Description of Development Process)**

৯.৪ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের লেভেল ও স্টেজ **(Kohlberg's level nad stages of moral development)**

৯.৫ কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য **(Educational implications of Kohlberg theory)**

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা **(Criticism of Kohlberg moral development)**

৯.৬ সারাংশ **(Summary)**

৯.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Question)**

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যা শিখবে—

- কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবে।
- কোহলবার্গ প্রস্তাবিত নৈতিক বিকাশের স্তরগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবে।
- কোহলবার্গ-এর তত্ত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হবে।
- কোহলবার্গ-এর তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবে।

৯.২ ভূমিকা (Introduction)

লরেন্স কোহলবার্গ মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক বিকাশ কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তার তত্ত্বকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বলা হয়। কোহলবার্গের জীবনে দার্শনিক চার্লস মরিস এবং মনোবিজ্ঞানী রবার্ট হ্যাভেগহার্স্ট এর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর জীবনদর্শনেও এই দুই মনীষীর প্রভাব দেখা যায়। তাই তাঁর নৈতিক বিকাশের তত্ত্বও একই সঙ্গে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর যুক্তির বিচার বিশ্লেষণ করে কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বিকাশ হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমসমন্বয়মূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে। মানুষের আচরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব স্থাপিত হয়। নৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার তিনটি মূল উপাদান এখানে আলোচিত হয়। কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের স্তরগুলি নিম্নে উপস্থাপিত হয়। কোহলবার্গ তত্ত্বের মূল্যায়ন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কোহলবার্গ তত্ত্বের তাৎপর্য বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয় নিম্নলিখিত বিভাগে।

৯.৩ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ও বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Kohlberg's Theory of Moral Development, Description of Development Process)

৯.৩.১ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Moral Development Theory)

লরেন্স কোহলবার্গ মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক বিকাশ কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বলা হয়। কোহলবার্গের জীবনে দার্শনিক চার্লস মরিস এবং মনোবিজ্ঞানী রবার্ট হ্যাভিগ-হাস্টের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর জীবনদর্শনেও এই দুই মনীষীর প্রভাব দেখা যায়। তাই তাঁর নৈতিক বিকাশের তত্ত্বও একই সঙ্গে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর যুক্তির বিচারবিশ্লেষণ করে কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, বিকাশ হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমসমন্বয়মূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Theory of Moral Development): কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব মানুষের আচরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলি হল—

A. শৈশবে শিশুর যেটুকু জ্ঞানমূলক বিকাশ হয় তার দ্বারা সে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। উভয় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য শিশু

নানাপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। সামাজিক পরিবেশে শিশু ও সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হল নৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি।

B. নৈতিক বিকাশ হল একপ্রকার জ্ঞানমূলক বিকাশ, কারণ নৈতিক আচরণের উৎস কোনো প্রাক্ষোভিক কেন্দ্র নয়। নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর, যা জ্ঞানমূলক বিকাশের ফলেই সম্ভব।

C. মানুষের তিনটি ক্ষমতা তার নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। এগুলি হল— তার বাহ্যিক আচরণ, সে কেন ওই আচরণ করছে এবং ওই আচরণের ফলে তার অভ্যন্তরীণ কী পরিবর্তন ঘটবে-এই তিনটির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।

৯.৩.২ বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Description of Development Process):

কোহলবার্গ মানুষের নৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মূল উপাদান হল ৩টি। এগুলি হল—

১) **জ্ঞানমূলক বিকাশ (Cognitive Development):** কোহলবার্গ পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের নীতি অনুযায়ী বলেছেন যে, জ্ঞানমূলক বিকাশ ব্যস্তির সামাজিক-নৈতিক মান নির্ণয়ে সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যক্তির নীতিবোধ তার জ্ঞানমূলক বিকাশের উপর করে গড়ে ওঠে। তবে জ্ঞানমূলক বিকাশ ছাড়াও অন্য যে উপাদানগুলি নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে, সেগুলি হল-জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব ও ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা।

২) **জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব (Cognitive Conflict):** বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যেমন—

i) যদি ব্যক্তির মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বিশ্বাস আবির্ভূত হয়,

ii) যদি ব্যক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের সংঘাত হয়। অথবা

iii) কোহলবার্গের মতে-ব্যক্তির নীতিবোধ তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানমূলক স্তরে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ব্যক্তি যখন জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করে তখনই তার নৈতিক ধারণাগুলির পৃথকীকরণ ঘটে এবং ক্রমোচ্চ স্তরে সমন্বয়িত হয়। এইভাবেই ব্যক্তি যুক্তিনির্ভর হয় এবং তার নীতিবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং, জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার যে প্রচেষ্টা তার থেকেই ব্যক্তির নৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটে।

৩) **নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা (Role taking ability) :** কোহলবার্গ বলেছেন-ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা হল, কোনো পরিস্থিতিকে অন্যের মতো করে দেখে মূল্যায়ন করা বা মর্যাদা দেওয়া। এই

ক্ষমতার দ্বারাই ব্যক্তি তার নিজের কোনো বিশ্বাসকে অন্যের বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করে নৈতিক বিচারকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ যে অন্যের মতামতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তার নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা বেশি।

উপরোক্ত তিনটি উপাদান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কারণ জ্ঞানমূলক বিকাশ, জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের কারণ, আর এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন। নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদানেরই গুরুত্ব থাকলেও জ্ঞানমূলক বিকাশ নৈতিক বিকাশের মূল নিয়ন্ত্রক।

কোহলবার্গ পিঁয়াজের গবেষণাকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন ও বলেন নৈতিক বিকাশের তিনটি লেভেল আছে এবং প্রত্যেকটি লেভেলে আবার দুটি করে স্টেজ আছে সেগুলি হল—

৯.৪ কোহেলবার্গের নৈতিক বিকাশের লেভেল ও স্টেজ (Kohlburg's level and stages of Moral Development)

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের লেভেল ও স্টেজ হল—

লেভেল (Level)	**স্টেজ (Stage)**
প্রাক্-সংস্কারমূলক পর্যায় (Pre-conventional Level)	**প্রথম স্তর (First Stage) :** শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ (Punishment obedience orientation)
	দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ (Personal reward orientation)
সংস্কার প্রভাবিত পর্যায় (Conventional Level)	**তৃতীয় স্তর (Third Stage) :** প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ (Good Boy Nice girl orientation)
	চতুর্থ স্তর (Forth Stage) : সমাজ নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Law and order orientation)
সংস্কারমুক্ত পর্যায় (Post-conventional Level)	**পঞ্চম স্তর (Fifth Stage) :** সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation)
	ষষ্ঠ স্তর (Sixth Stage) : সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical principle orientation)

A. প্রথম পর্যায়: প্রাকসংস্কারমূলক পর্যায় (Pre-conventional Level) : এই পর্যায়ে মানুষ ভালো-মন্দ বিচার করে তার নিজের চাহিদা ও প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। এই সময়ে সমাজস্বীকৃত নিয়মনীতি সে বোঝে না। এই পর্যায়ের দুটি স্তর—

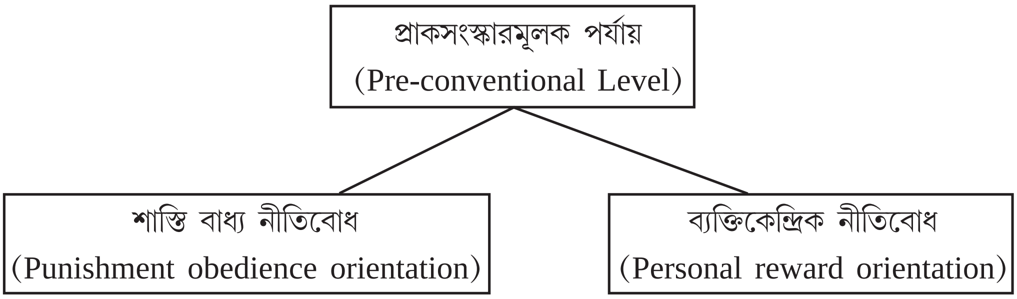

১. প্রথম স্তর: শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ (Punishment obedience orientation): এই স্তরে মানুষের প্রকৃত নৈতিকতা সৃষ্টি হয় না। যে কাজ করলে শাস্তি হয়, সেই কাজ করা উচিত নয়— এটাই তার নীতিবোধ।

২. দ্বিতীয় স্তর : ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ (Personal reward orientation) : নিজের স্বার্থের ভিত্তিতেই সে কোনো কাজকে ঠিক-ভুল বিচার করে। যে কাজ করলে তার নিজের স্বার্থ বা চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়, সেই কাজকেই সে ঠিক বলে ধরে নেয়।

B. দ্বিতীয় পর্যায়: সংস্কার প্রভাবিত পর্যায় (Conventional Level)

পরিবারের সদস্য, সমাজের মানুষ, ঐতিহ্য, সামাজিক নিয়মনীতি, রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষ এই পর্যায়ে ঠিক-ভুল বিচার করে। এই পর্যায়ের প্রথমে সে ছোটো দলের মতামতকে গুরুত্ব দেয় ও ধীরে ধীরে তার ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হয়। এই পর্যায়ের দুটি স্তর হল—

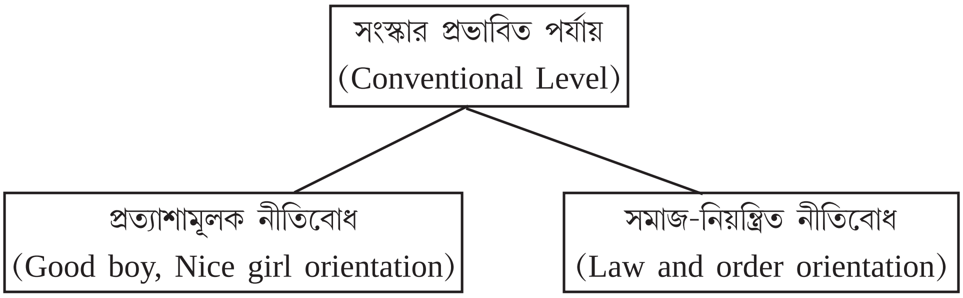

৩. তৃতীয় স্তর: প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ (Good boy, Nice girl orientation) : এখানে কোনো কাজ ঠিক না ভুল সেটা ঠিক হয় অন্যরা সেই কাজকে ঠিক না ভুল বলছে তার উপর। যে কাজ করলে অন্যের প্রশংসা পাওয়া যায়, সেই কাজকেই সে ঠিক বলে মনে করে।

৪. চতুর্থ স্তর: সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Law and order orientation): সমাজের বা রাষ্ট্রের নিয়মনীতি মেনে যে কাজ করা হয় সেই কাজকেই সে ঠিক বলে মনে করে। সে সামাজিক নিয়মনীতিকে মান্য করে এবং সেগুলিকে মেনেই কাজ করতে চায়।

A. তৃতীয় পর্যায়: সংস্কারমুক্ত পর্যায় (PostéŸéconventional Level):

এই পর্যায়ে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত নীতি দ্বারা ভালো-মন্দ বিচার করে। সেই বিচার সবসময় সমাজস্বীকৃত নাও হতে পারে এবং তা জেনেও সে কোনো কাজকে ভালো বলতেও পারে। এখানে দুটি পর্যায় রয়েছে—

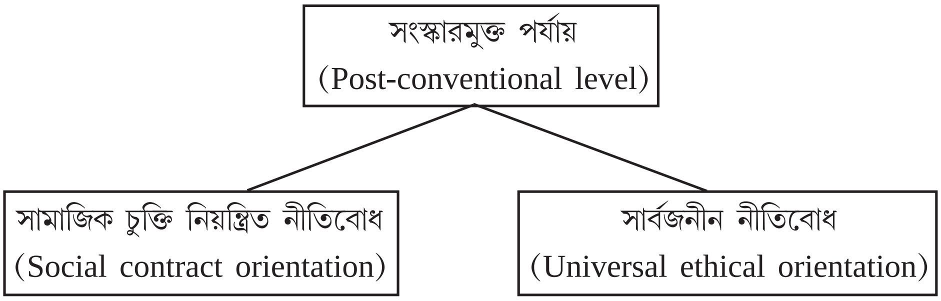

৫. পঞ্চম স্তর: সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation): সমাজস্বীকৃত মানুষের যে অধিকার রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই স্তরে ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং সে মনে করে সমাজের ভালোর জন্য আইনও পাল্টানো যেতে পারে।

৬. ষষ্ঠ স্তর: সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical principal orientation): এখানে ভালোমন্দের বিচার পুরোপুরি মানুষের বিবেকবোধের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু যুক্তিকরণের ক্ষমতা রয়েছে, তার উপর নির্ভর করেই সে বিচার করে। এখানে সমাজস্বীকৃত বা রাষ্ট্রস্বীকৃত নীতিসমূহ সে জানলেও তার ঊর্ধ্বে গিয়ে সে বিচার করে।

৯.৫ কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational implications of Kohlberg's Theory):

কোহলবার্গের মত অনুসারে মানুষের নৈতিক বিকাশ নির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে আসে এবং সে কোনো স্তর বা পর্যায় বাদ দিয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে না। তিনি আরও বলেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছায় না। এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব (Cognitive dissonance)। তিনি আরও বলেন এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দলগত আলোচনা (group discussion)। উক্ত দলটির সদস্যরা বিষম প্রকৃতির হলে এই ধরনের নীতিশিক্ষা ভালো হয়। শিক্ষক এই ধরনের আলোচনাতে পরোক্ষভাবে যোগদান করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। উপরের আলোচনাকে যদি আমরা কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাপে ভাগ করি, তাহলে সেগুলি হলো—

- প্রথমে শিক্ষক একটি দল তৈরি করবেন যেখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীরা থাকবে যাতে তাদের মধ্যে যেন ব্যক্তি বৈষম্য থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি দ্বন্দ্ব (dilemma) উত্থাপন করবেন। দ্বন্দ্বটি বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে ভালো হয়।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা এই দ্বন্দ্বের উপর শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করবেন। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনাকেও গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবেন।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না। তিনি এমনভাবে পরিচালনা করবেন যেন সবাই নিজের মতামত জানাতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা যখন একে অপরের মতামত শুনবে তখন তাদের নীতিবোধের বিকাশ ঘটবে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Kohlberg Moral development theory): কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন। তার তত্ত্বের সমালোচনা অংশগুলি হল—

১) কোহলবার্গের তত্ত্বে কিছু নির্দিষ্ট বয়স সীমা নির্ধারণ করে আচরণ বা বিচারকরণ ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা এই হিসেবে মানুষের নৈতিক বিকাশ ঘটে না। তার তত্ত্বে বলা হয়েছে কুড়ি বছরের পরে মানুষ পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজে পৌঁছায়। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে লক্ষ্য করা যায় এই স্তরের মানুষ পৌঁছেও পূর্বের স্থানে গিয়ে নৈতিক বিচার করেন বা করতে পারেন।

২) কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পরীক্ষা তত্ত্বে যে ডিলেমা (Dilema) সৃষ্টি করেছেন তাতে মানবিক সম্পর্ককে গুরুত্ব আরোপ করেনি।

৩) কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের আর একটি সীমাবদ্ধতা হলো তিনি পুরুষদের নৈতিক বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার তত্ত্বে নারীদের নৈতিক বিকাশের কোন পার্থক্য আলোচনা করা হয়নি।

৪) কোহলবার্গ পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ (Conventional Stage) এর মাধ্যমে যে দুটি স্তরের কথা বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই স্তর দুটি পৃথক নয়, একই।

কোহলবার্গের তত্ত্ব নিয়ে গিল্লিগান্স (Carol Gilligans) এর সমালোচনা: Carol Gilligans হলেন কোহলবার্গের শিক্ষার্থী এবং সহকর্মী। যখন গিল্লিগান্স তার নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন তখন সেই তত্ত্বের ওপর অর্থাৎ Heinz এর moral dilema এর উপর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন গিল্লিগান। তিনি কোহলবার্গের male centred approach কে সমালোচনা করেছেন। কারণ কোহলবার্গ যে তথ্য

প্রকাশ করেছেন সেখানে মেয়েদের নৈতিক বিকাশের দিকটি আলোচনা করা হয়নি।

৯.৬ সারাংশ (Summary)

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী লরেন্স কোহলবার্গ ব্যক্তির একেধারে শৈশব থেকে নৈতিক বিকাশের উপর একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির একশোজন শিশুর উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে কোহলবার্গ যে তথ্য সংগ্রহ করেন তার উপর ভিত্তি করেই কোহলবার্গ তাঁর ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেন। কোহলবার্গের মতে নৈতিক বিকাশ হলো ব্যক্তির নৈতিক বিচারবোধের বিকাশ। কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব মানুষের আচরণের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাহা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের ব্যাখ্যা অনুসারে ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মূল উপাদান হল ৩টি। যথা—জ্ঞানমূলক বিকাশ, জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব ও নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা। কোহলবার্গের মতে নৈতিক বিকাশের তিনটি লেভেল আছে এবং প্রত্যেকটি লেভেলে দুটি করে স্টেজ আছে।

লেভেল (Level)	স্টেজ (Stage)
প্রাক্-সংস্কারমূলক পর্যায় (Pre-conventional Level)	**প্রথম স্তর (First Stage) :** শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ (Punishment obedience orientation)
	দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ (Personal reward orientation)
সংস্কার প্রভাবিত পর্যায় (Conventional Level)	**তৃতীয় স্তর (Third Stage) :** প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ (Good Boy Nice Girl orientation)
	চতুর্থ স্তর (Forth Stage) : সমাজ নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Law and order orientation)
সংস্কারমুক্ত পর্যায় (Post-conventional Level)	**পঞ্চম স্তর (Fifth Stage) :** সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation)
	ষষ্ঠ স্তর (Sixth Stage) : সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical principle orientation)

এই ইউনিটে কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য এবং কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়েছে।

৯.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. কোহলবার্গের মতে নৈতিক শিক্ষা কি?

২. নৈতিক বিকাশ কি?

৩. নৈতিক বিকাশের লেভেলগুলি কি কি?

৪. কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য কি?

৫. কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

পর্যায়-৪

শিখনের মানসিক প্রক্রিয়া

(Mental Process of Learning)

একক ১০ ❑ স্মরণ ক্রিয়া (Memory)

গঠন (Structure)

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.২ ভূমিকা (Introduction)

১০.৩ স্মৃতির সংজ্ঞা, উপাদান, শ্রেণীবিভাগ (Definition, Component and Types of Memory)

১০.৪ স্মৃতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব (Memory and Information Processing Theory)

শিক্ষায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য (Educational significance of the Information Processing Theory)

১০.৫ বিস্মৃতি ও বিস্মৃতির কারণ (Forgetting and Causes of Forgetting)

১০.৬ সারাংশ (Summary)

১০.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Question)

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যা শিখবেন—

- স্মৃতি ও বিস্মৃতির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- স্মৃতির উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেলের সাহায্যে স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বিস্মৃতির প্রচলিত কারণগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিস্মৃতির সংজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।
- স্মৃতির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১০.২ ভূমিকা (Introduction)

শিখনের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে যে মানসিক প্রক্রিয়াটির কথা এসে পড়ে তা হল স্মৃতি ও বিস্মৃতি। মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া। শিখনের মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি যদি তা আমাদের স্মৃতিতে ধরে

রাখতে না পারি, তবে শিখন অর্থহীন। মনোবিজ্ঞানের আদি লগ্নে প্রথম যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল স্মৃতি ও বিস্মৃতি তার অন্যতম। স্মৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেলেও এখনও অনেক কিছু অজানা। এখানে স্মৃতি ও বিস্মৃতির প্রচলিত ধারণা ও ব্যাখ্যার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হল।

১০.৩ স্মরণক্রিয়া (Memory)—স্মৃতির সংজ্ঞা, উপাদান ও শ্রেণীবিভাগ (Definition, Components and Types of Memory)

১০.৩.১ স্মৃতির সংজ্ঞা (Definition of Memory)

অতীত প্রত্যক্ষ (Perception) বা অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলো (Images) অবিকলভাবে পুনরুৎপাদন করবার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে।

প্রচলিত অর্থে (Conventional Meaning) : প্রচলিত সাধারণ অর্থে স্মৃতিকে একটি গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন আমরা বলি শ্যামলের স্মৃতি খুবই প্রখর ইত্যাদি।

প্রাচীন ধারণা (Traditional Concept) : প্রাচীনকালে স্মৃতিকে এক প্রকার মানসিক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হত। বলা হয় স্মৃতি মনের একটি ভাণ্ডার।

দার্শনিক অর্থে (Philosophical Meaning) : দার্শনিকদের মতে যেসব অভিজ্ঞতা বর্তমানে চেতন মনে নেই অথচ পূর্বে ছিল, সেইসব অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে চেতন স্তরে আনার ক্ষমতাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।

মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে (Psychological Meaning) : মনোবিজ্ঞানে স্মৃতিকে কোনো গুণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতি বলতে স্মরণক্রিয়াকেই বোঝায়।

আধুনিক অর্থে (Modern Meaning) : বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, "পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগতভাবে তাকে পুনরায় মনে করার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি"।

মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth) এর মতে "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোনো বিষয়কে একইভাবে পরবর্তীকালেও সম্পাদন করতে পারি তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।"

মনোবিদ টেলফোর্ড (Telford) বলেছেন, "শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়, আর সেই পরিবর্তনকে ধারণ করে রাখার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি।"

মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন "যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হয় তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া। তাঁর মতে স্মরণ ক্রিয়ার অন্তর্গত হল—শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক।

মনোবিদ রাইবার্ন (Ryburn—1956) স্মৃতি বা স্মরণ বলতে এক ধরনের শক্তিকে বুঝিয়েছেন যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে রাখে এবং পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাকে সচেতন মানসপটে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

১০.৩.২ স্মৃতির উপাদান (Components of Memory) :

স্মৃতি একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া যাকে তিনটে উপাদানে ভাগ করা যায়—

১. শিখন বা স্থিরকরণ (Learning)

২. সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention)

৩. পুনরুত্থাপন (Re-production)

পুনরুত্থাপনকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়—

(a) পুনরুদ্রেক (Recall)

(b) প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)

১. শিখন বা স্থিরকরণ (Learning) : কোনো বিষয় স্মরণের জন্য প্রথম যে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তা হল শিখন। কোনো বিষয়বস্তুকে একাধিকবার পাঠের মাধ্যমে তাকে মনের অভ্যন্তরে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বিত করাকেই শিখন বলে।

কোনো একটি বিষয়কে একাধিকবার পাঠ করলে শিখনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বারবার পাঠ করার ফলে বিষয়টিকে তার ক্রমপর্যায় বজায় রেখে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা সম্ভব। এই অবস্থাকেই পূর্ণ শিখন বলা হয়। স্মৃতিতে এই পূর্ণ শিখনের প্রয়োজন। পূর্ণ শিখনের পরেও যদি পাঠ চালিয়ে যাওয়া হয় তাকে বলে অতিশিখন যা দীর্ঘস্মৃতির পক্ষে সহায়ক।

২. সংরক্ষণ বা ধারণ ক্রিয়া (Retention) : শিখনলব্ধ বিষয়বস্তুগুলো আমাদের মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন স্তরে চলে যায় এবং সংরক্ষিত হয়। যেটুকু আমরা সংরক্ষণ করতে পারি বা ধরে রাখতে পারি সেটুকু আমাদের স্মৃতি বলে গণ্য হয়। যে প্রক্রিয়ায় ধারণ বা সঞ্চয় সম্ভব হয় সেটাই হলো সংরক্ষণ বা ধারণ ক্রিয়া।

মনোবিজ্ঞানী মুলার (Muller) এর মতে আমাদের মস্তিষ্কের কোনো অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি ক্যামেরার

ফিল্মের মতো স্মৃতিছাপ (Memory Trace) রূপে সংরক্ষিত হয়। এই ধরে রাখার ক্ষমতা যার যত বেশি তার স্মৃতি তত প্রখর বলে আমরা মনে করি।

এখানে ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হল—

১. **শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা (Attitude Mental Set) :** শিক্ষার্থীকে কোনো কিছু শেখাতে হলে আগ্রহ জাগাতে হবে।

২. **পুনরাবৃত্তি (Repetation) :** মনে রাখার জন্য অনুশীলন, চর্চা বা অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন।

৩. **শিক্ষণীয় বিষয়ের স্পষ্টতা (Vividness of the learned material)**

৪. **ছন্দ ও অর্থ (Rhyme and meaning) :** অর্থপূর্ণ ও ছন্দোময় পাঠ্য বিষয় আমাদের বেশী মনে থাকে।

৫. **শিখনের মাত্রা (Degree of Learning) :** অধিক শিখন ধারণ ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে।

৬. **শিখন পদ্ধতি (Learning Method) :**

ক) **মিউম্যান (Meuman)** পরীক্ষা করে দেখেছেন কোনো বিষয় খণ্ড খণ্ড ভাবে পাঠ করে মুখস্থ করার থেকে সমগ্রটা এক সঙ্গে পাঠ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে শিখনের সমগ্র থেকে আংশিক বলা হয়। এতে পরিশ্রমও কম হয়, ধারণ ভালো হয়।

খ) **সবিরাম পদ্ধতি (Distributed Learning) :** এক সঙ্গে দীর্ঘ সময় না পড়ে আমরা যদি মাঝে মাঝে বিরতি অর্থাৎ বিশ্রাম দিয়ে পড়ি তাহলে বিষয়বস্তুকে বেশী তাড়াতাড়ি নিজের আয়ত্তে আনতে পারি।

গ) **সক্রিয় পদ্ধতি (Active Learning) :** সক্রিয় পদ্ধতি হলো আবৃত্তি সহযোগে শব্দ করে পড়া যার ফলে আমরা একাধিক ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তুলতে পারি। এতে শিখন ভালো হয়, ধারণও ভালো হয়।

৭. **সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন (Learning by doing) :** হাতেকলমে কাজ করলে বোধগম্যতা বাড়ে, শিখন ভালো হয়। দীর্ঘসময় মনে রাখতে পারা যায়।

৮. **দেহ-মনের সুস্থতা (Psycho-Physical fitness) :** দেহ মন সুস্থ থাকলে কোনো কিছু শিখতে আমাদের মনে আগ্রহ জাগায়।

৯. **বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) :** যে সব ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী তারা খুব তাড়াতাড়ি অধিক বিষয় শিখতে পারে এবং মনে ধরে রাখতে পারে। স্মৃতিতে ধারণ দু-রকমভাবে হয়।

ধারণ

দীর্ঘ সময়ের জন্য (Long term)

স্বল্প সময়ের জন্য (Short term)

সংযুক্তকরণ (Encoding) : সংকেতযুক্তকরণ বলতে বোঝায়— তথ্য বা বার্তা বাইরের পরিবেশ থেকে উদ্দীপক হিসেবে সেন্সরি রেজিস্টারে পৌঁছোনোর পর বার্তা বা তথ্যটিকে নিজের মতো করে গ্রহণ করা। সংকেতযুক্তকরণ তিন ধরনের হয়—

সংকেতযুক্তকরণ (Encoding)

দৃশ্যগত সংকেতযুক্তকরণ Viral (Picture)

শব্দগত সংকেতযুক্তকরণ Acoustic (Sound)

অর্থগত সংকেতযুক্তকরণ Semantic (meaning)

পুনরুত্থাপন (Re-production) : পুনরুত্থাপন বলতে বোঝায় বিষয় বা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনরুদ্রেক করা (Recall) বা চিনে নেওয়া (Recognition) পুনরুদ্রেকের উদাহরণ হল আমাদের কবিতা আবৃত্তি করা বা পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখা। পুনরুদ্রেককে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়— প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক এবং পরোক্ষ পুনরুদ্রেক। প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেককে অন্য কোনো মধ্যবর্তী বস্তুর সাহায্য নিতে হয় না। যেমন রামের কথা মনে হলেই শ্যামের কথা মনে পড়ে। আবার যখন মধ্যবর্তী কোনো বিষয় বা বস্তুর এসে যাওয়ার ফলে মনে পড়ে তখন বলা হয় পরোক্ষ পদ্ধতি। যেমন— রামের কথা মনে পড়লে মধুর (শ্যামের ভাই) কথা মনে হয়। এখানে রামের কথা মনে হলে প্রথমে শ্যামের কথা মনে হয়, পরে শ্যামের ভাই মধুর কথা মনে হয়। এছাড়া আছে আংশিক পুনরুদ্রেক—অনেক সময় দেখা যায় যে বস্তুটির সাথে আংশিক বা অস্পষ্ট মিল আছে এমন কিছু দেখলে বা শুনলে আমরা বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে মনে করতে পারি। পুনরুত্থাপনের আর একটি ভাগ হল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চিনে নেওয়া। আমরা অনেক সময় অধীত বিষয় বা অভিজ্ঞতা পুনরুদ্রেক করতে পারি না কিন্তু চিনতে পারি—যেমন কোনো বন্ধুর নাম হয়তো মনে করতে পারছি না কিন্তু একজন যদি সেই বন্ধুর নাম উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে বন্ধুর নাম চিনে নিতে পারি। এটাই হল প্রত্যাভিজ্ঞা। পুনরুদ্রেকের সঙ্গে প্রত্যাভিজ্ঞার মৌলিক পার্থক্য হল পুনরুদ্রেক ঘটে বস্তুর অনুপস্থিতিতে আর প্রত্যাভিজ্ঞা ঘটে বস্তুর উপস্থিতিতে।

পুনরুদ্রেকের শর্তাবলী (Conditions of Recall) : পুনরুদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয় তা নিয়ে কয়েকটি মতবাদ—

i) অনুভাবন ও অনুষঙ্গ (Suggestion and Association) : অনুভাবন প্রক্রিয়া হলো সেই প্রক্রিয়া

যার মাধ্যমে একটি প্রতিচ্ছবি অপর একটি প্রতিচ্ছবিকে পুনরুৎপাদিত করে। অনুষঙ্গ হলো একটি বিশেষ গুণ যা অতীতের দুটো ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা ধারণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং তাদের যে কোনো একটি চেতনায় উপস্থাপিত হলে অপরটি সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় উপস্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর কথা বলি তখন তার স্থপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায়। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানসিক সংযোগ তা হলো অনুষঙ্গ আর প্রথাটির প্রতিরূপ যে দ্বিতীয়বার প্রতিরূপকে অবচেতন মন থেকে চেতন মনে নিয়ে আসছে সেটাই হলো অনুভাবন। অনুষঙ্গ তিনভাবে গড়ে ওঠে—

সান্নিধ্যের অনুষঙ্গ : যে সব বস্তু স্থান ও কালের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান করছে তাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্যের অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়। হাওড়ার কথা বললে হাওড়া ব্রীজের কথা মনে পড়ে যায়।

সাদৃশ্যের অনুষঙ্গ : যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, তাহলে প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরস্পরের জন্য অনুষঙ্গ স্থাপন করে। রামের সঙ্গে হরির আকৃতিগত মিল, রামকে দেখলেই হরির কথা মনে পড়ে যায়।

বৈসাদৃশ্যের অনুষঙ্গ : দুটি বিষয়ের মধ্যে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটির প্রতিরূপ অপর প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন— আলো-অন্ধকারের, মোটা-রোগার, সুন্দর-কুৎসিতের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুনরুদ্রেক করার সময় প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ এরা স্মৃতি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। মানসিকভাবে দুর্বল হলে চলবে না। পুনরুদ্রেকের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। প্রণালীবদ্ধভাবে চিন্তা করতে হবে। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার পুনরুদ্রকের চেষ্টা করতে হবে।

প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) : প্রত্যাভিজ্ঞা স্মৃতির একটি অংশ। শুধু পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের ধারণ এবং পুনরুৎপাদন স্মরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হয়েছিল পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপ যে এই প্রতিরূপ, এই পুনর্জ্ঞানও স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। স্মরণে এর প্রতিরূপকে কোনো পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিরূপ বলে চিহ্নিত করা বা পুনরায় জানা চাই। যে বিষয়টি পূর্বে জানা হয়েছিল, তাই যে পুনর্বার জ্ঞাত হচ্ছে। এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যাভিজ্ঞা বলা হয়। পূর্ব অধীত বা জ্ঞাত বিষয়কে চিনে নেওয়ার ক্ষমতাকে বলে প্রত্যাভিজ্ঞা। যেমন—অনেকদিন পর কোনো এক স্কুলের বন্ধুকে দেখে চিনতে পারা। প্রত্যভিজ্ঞাকে অনেকে প্রত্যক্ষণও বলে থাকেন।

১০.৩.৩ স্মৃতির শ্রেণীবিভাগ (Types of Memory) :

আধুনিক মনোবিদগণ স্মৃতিকে এক ধরনের মানবিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন। বিভিন্ন ধরনের

অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হ'ল। মনোবিদ বার্গসঁ (Bargson) স্মৃতিকে দুভাগে ভাগ করেছেন। (i) অভ্যাসগত স্মৃতি (ii) প্রকৃত স্মৃতি।

অভ্যাসগত স্মৃতি : যখন অভ্যাসবশত আমরা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ঘটনাকে স্মরণ করি, তখন তাকে বলা হয় অভ্যাসগত স্মৃতি। অর্থাৎ না বুঝে বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যখন আমাদের শিখন হয় এবং সেই শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা যখন আমরা পরবর্তীকালে স্মরণ করি, তাকে বলা হয় অভ্যাসগত স্মৃতি।

প্রকৃত স্মৃতি : বিষয়বস্তুর হৃদয়ঙ্গমের ফলে আমরা যখন মানসিক কল্পের সাহায্যে বস্তুকে স্মরণ করি, তখন তাকে বলা হয় প্রকৃত স্মৃতি। বিষয়বস্তুর উপলব্ধির জন্য যুক্তিশক্তির প্রয়োজন হয় বলে অনেকে একে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি আখ্যা দিয়েছেন।

সংবেদনমূলক স্মৃতি : ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা সংবেদনগত তথ্য গ্রহণ করি। পরে স্নায়ুতন্ত্র মারফত সেই তথ্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কেই প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষিত হয়। এই তথ্য স্নায়ুকেন্দ্রে ক্ষণিক সময়ের জন্য অবস্থান করে এবং মস্তিষ্ক সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে অর্থবহ করে। এই ক্ষণিক সময়ের (1 sec এর মতো) স্মৃতিকে বলা হয় তাৎক্ষণিক স্মৃতি। Atkinson এবং Shiffrin এর মতে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের প্রেক্ষিতে সংবেদনমূলক স্মৃতি আছে। যেমন—দর্শনজাত স্মৃতি, শ্রবণজাত স্মৃতি, ঘ্রাণজাত স্মৃতি, স্পর্শজাত স্মৃতি এবং স্বাদজাত স্মৃতি।

স্থায়ী স্মৃতি : কোনো কিছু অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার পর অনেক সময় পরে স্মরণ করাকে বলা হয় স্থায়ী স্মৃতি (Permanent Momory)।

তাৎক্ষণিক স্মৃতি : শিখনের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্মরণ করাকে বলা হয় তাৎক্ষণিক স্মৃতি (Immediate Memory)।

ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি বা কার্যকরী স্মৃতি : সেন্সরী রেজিস্টার দিয়ে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে আগত তথ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে কার্যকরী স্মৃতি কাজ করে। এখানে তথ্য স্থায়ীভাবে থাকে না। তথ্য কমবেশী 30 সেকেন্ডের কাছাকাছি স্থায়ী হয়। এই স্তর থেকে কিছু তথ্য LTM স্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রবেশ করে। বাকী তথ্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে। এই পর্যায়ে স্থির হয় কোন তথ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে যাবে এবং কোনগুলি বর্জিত হবে।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি : দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংবেদনজাত তথ্যসকল স্থায়ী হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে বর্তমানে ব্যবহৃত নয় এমন অসংখ্য সংকেতায়িত (encoded) বস্তু স্মৃতিতে থাকে। সংকেতায়ন বিভিন্ন রকমের হতে পারে, ভাষাগত (Linguistic), কল্পগত (Image) এবং সঞ্চালনগত (Motor)। ভাষাগত সংকেতায়নে সংবেদনগত তথ্যকে শব্দের মাধ্যমে সংকেতায়িত করা হয়। কল্পনাগত সংকেতায়নে কল্প বা মানসিক প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে এবং শারীরিক দক্ষতাসমূহকে যেমন—সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা ইত্যাদি সঞ্চালনগত সংকেতায়নের মাধ্যমে মনে রাখা হয়।

তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যায় না। সেটির জন্য কিছু কৌশল প্রয়োজন—

পুনরাবৃত্তি (Repitition) : তথ্য বারংবার মনে করার চেষ্টা করলে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পৌঁছোয়।

বিস্তৃতিকরণ (Elaboration) : এর মানে হল নতুন তথ্যকে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে অর্থপূর্ণ করা।

বিভাজিত অনুশীলন (Distributed practice) : এর অর্থ হল বিশ্রাম ও বিরাম সহযোগে অল্প অল্প সময় ধরে অনুশীলন করা। অনেক তথ্য একসঙ্গে টানা মনে রাখার চেষ্টা করলে সমস্যা তৈরী হয়, এবং দীর্ঘস্থায়ী স্তরে পৌঁছতে পারে না।

অর্থগত স্মৃতি (Semantic memory) : এখানে ধারণা, শব্দ সম্পর্কিত তথ্য সঞ্চিত থাকে যেমন গ্রহ, গাছ প্রভৃতির তথ্য।

পর্যায়ক্রমিক স্মৃতি (Episodic memory) : এটি হল বিভিন্ন ঘটনা যা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে সেগুলির স্মৃতি। যেমন কেউ একজন বেড়িয়ে এসে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কী দেখেছিল তার বিবরণ দিতে পারে।

ক্রিয়াগত স্মৃতি (Procedural Memory) : কোনো একটি কাজের প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই সম্পর্কিত তথ্য এখানে সঞ্চিত থাকে। যেমন— কীভাবে গাড়ি বা কম্পিউটার চালাতে হয় তা স্মৃতিতে রাখা।

চিত্রগত স্মৃতি (Photographic Memory) : কোনো ছবি বা চিত্র সম্বন্ধীয় তথ্য এই স্মৃতিতে গচ্ছিত থাকে।

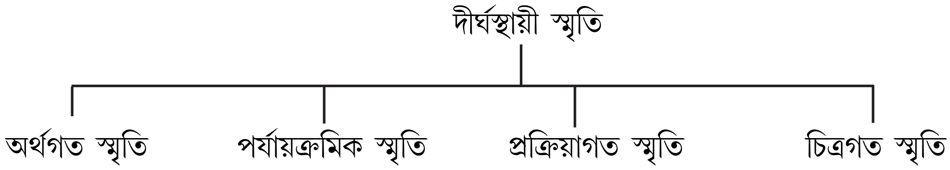

অনেকে আবার স্মৃতিকে মাধ্যমের দিক থেকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

i) ব্যক্তিগত স্মৃতি (Personal Memory)

ii) নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি (Impersonal Memory)

ব্যক্তিগত স্মৃতি : আমরা প্রত্যক্ষভাবে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং স্মরণ করি তাকে বলা হয় ব্যক্তিগত স্মৃতি।

নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি : আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা আসে অন্যের কাছ থেকে বা বই পড়ে। এইসব

অভিজ্ঞতার স্মরণকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি।

স্মৃতিকে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করার রীতিও প্রচলিত আছে।

সক্রিয় স্মৃতি : যখন শিক্ষার্থীরা মনে রাখার জন্য নিজেদের মানসিক ইচ্ছা বিশেষভাবে প্রয়োগ করে, তখন তাকে বলা হয় সক্রিয় স্মৃতি (Active Memory)।

নিষ্ক্রিয় স্মৃতি (Passive Memory) : যখন কোনো অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করার জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয় মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না তখন তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় স্মৃতি।

স্মৃতি যে রকম ধরনের হোক না কেন, আদর্শগত দিক থেকে তার্কিক স্মৃতি, স্থায়ী স্মৃতি, সক্রিয় স্মৃতি বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন।

১০.৪ স্মৃতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব (Memory and Information Processing Theory)

বর্তমান মানুষের স্মরণ প্রক্রিয়াকে কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কম্পিউটারের যেমন Input-Process-Outpur রয়েছে, তেমনি মানুষের স্মরণক্রিয়াতেও এই তিনটি প্রক্রিয়া কাজ করে বলে এই মতবাদে বিশ্বাস করা হয়।

স্মৃতির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Atkinson এবং Shiffrin—1968। এই মডেলে বলা হচ্ছে তথ্য পরিবেশ থেকে আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেন্সরি রেজিস্টারে প্রবেশ করে। এই মডেলে বলা হয়েছে মানুষের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের দুটি মূল দিক—১. সাংগঠনিক (Structure) ২. প্রক্রিয়াগত দিক।

১. সাংগঠনিক দিক (Structure) : মানুষের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তন্ত্র তিনটি স্তরবিশিষ্ট। এগুলি হল—

i) সংবেদন স্তর (Sensory Register)

ii) ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short-term Memory)

iii) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long-term Memory)

(i) সংবেদন স্তর : যখন কোনো উদ্দীপক মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে তখন ক্ষণকালের জন্য তার একটি কল্প বা ইমেজ সৃষ্টি হয়। এর স্থায়িত্ব এক থেকে দুই সেকেন্ড। এই কল্পগুলি হল কোড্ বা সংকেত। এই কল্পগুলিকে অল্প সময় ধরে রাখার জন্য রয়েছে সংবেদন স্তর বা সেনসরি রেজিষ্টার। এই সংবেদন স্তরের বৈশিষ্ট্য হল—

- মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপযোগী কল্প ধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ সংবেদন স্তর আছে।

- প্রত্যেকটি সংবেদন স্তরেই বহু সংখ্যক তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা আছে।
- এই তথ্যগুলি অর্থহীনভাবে আসে এবং খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়।
- সংবেদন স্তরে যত তথ্য আসে তার সবগুলি পরবর্তী স্তরে পৌঁছোয় না। কিছু তথ্য বাছাই হয়ে ও অর্থপূর্ণ হয়ে পরবর্তী স্তরে পৌঁছোয়।

ii) ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি : সংবেদন স্তর থেকে নির্বাচিত কিছু তথ্য ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে এসে পৌঁছোয়। মানুষের জ্ঞান আহরণ তন্ত্রে তাৎক্ষণিক স্মৃতিকেই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিকে কার্যকরী স্মৃতি (Working Memory)ও বলা হয়। এক্ষেত্রে যতক্ষণ তথ্যগুলি নিয়ে কাজ করা হয় ততক্ষণই তা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে থাকে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হল—

- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। ফলে এই স্মৃতিতে অভিজ্ঞতা খুব বেশী সময় থাকতে পারে না।
- এই স্তরে তথ্যগুলি মূলত ধ্বনি সংকেত হিসেবে থাকে।
- পুনরাবৃত্তি বা একই তথ্য পরিবেশিত না হলে এই স্মৃতিতে তথ্য ১৮ থেকে ২০ সেকেন্ডের বেশী থাকতে পারে না।
- তবে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির সীমিত স্থায়িত্বকালকে পুনরাবৃত্তির দ্বারা দীর্ঘতর করা যায়।
- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে কোনো তথ্য একবার চলে গেলে তার পুনরুদ্রেক সম্ভব নয়।
- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির পরিসর যেমন সীমিত তেমনি অভিজ্ঞতা ধরে রাখার সময়কালও সীমিত, একেই স্মৃতির পরিসর বলে। এই পরিসর ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয়।
- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে খুব বেশী পরিমাণ তথ্য প্রবেশ করতে পারে না। তাই কিছু পুরোনো তথ্য সেখানে থেকে সরিয়ে স্থায়ী স্মৃতিতে পাঠিয়ে দিলে সেখানে যে শূন্যস্থান পাওয়া যায় সেই স্থানে নতুন তথ্য প্রবেশ করানো যায়।
- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তথ্যগুলিকে দলবদ্ধভাবে সেখানে পাঠানো যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় চাঙ্কিং (Chunking)।
- পুনরাবৃত্তি এবং চাঙ্কিং—এই দুই প্রক্রিয়াই নির্ধারণ করে কোন্ অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে থাকবে, কী পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকবে এবং কোন্ তথ্য কী পরিমাণে স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হবে।

iii) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি : ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির পরবর্তী স্তর হল দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি। ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে কোনো বিষয় বা অভিজ্ঞতা স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়। স্থায়ী স্মৃতি হল এমন এক স্থায়ী জ্ঞানমূলক সংগঠন যা বহু সংখ্যক অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখতে পারে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির পরিসর ও মনে রাখার সময়কাল অনেক দীর্ঘ।
- স্থায়ী স্মৃতিতে একবার অভিজ্ঞতা প্রবেশ করলে তা দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায়। তবে কোনো তথ্য প্রায় অবিকৃত অবস্থায় স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা যায় না।
- স্থায়ী স্মৃতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন থাকে না। তাকে চেতনায় আনার জন্য ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হয়।
- স্থায়ী স্মৃতির অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রে বিস্মৃতি ঘটলেও তা অস্থায়ী।
- স্থায়ী স্মৃতির স্তরে মূল অভিজ্ঞতাটি পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মানসিক সংগঠন বা স্কিমা (Schema) তৈরী করে। এর মাধ্যমে মানসিক সংগঠন বিস্তৃত ও দৃঢ় হয়।

২. **প্রক্রিয়াগত দিক (Process) :** প্রক্রিয়াগত দিক বলতে মানুষের ব্যক্তিগত ক্রিয়াগুলিকে বোঝায়। ব্যক্তি পূর্বোক্ত তন্ত্র অর্থাৎ সাংগঠনিক স্তরগুলির মধ্য দিয়ে তথ্য পাঠানোর জন্য এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকেই বলা হয় প্রক্রিয়াকরণ।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের দিকগুলি আলোচিত হলো এখানে।

i) সংবেদন স্তরে তথ্য নির্বাচন : সংবেদন স্তর থেকে কিছু তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাছাই হয়ে পরবর্তী স্তর ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে আসে। মানুষ একে সচেতনভাবে করে না। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সেনসরি স্ক্রিনিং।

- এই বাছাইয়ের জন্য প্রয়োজন মনোযোগের এবং অর্থহীন তথ্যগুলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষণের (Perception) বা প্যাটার্ন-প্রত্যাভিজ্ঞা (Pattern recognition)।
- কোন তথ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে বা বাছাই তথ্যগুলির অর্থ কী তা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা বা শিখনের দ্বারা, শিখন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত বিশেষ নির্দেশ দ্বারা এবং প্রেষণার দ্বারা।
- অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্যে যেগুলির প্রতি আমরা বেশী মনোযোগ দিই সেগুলিই সংবেদন স্তর থেকে বাছাই হয়ে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে যায়। উদ্দীপকের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের ওপর মনোযোগ নির্ভর করে।

(a) বস্তুগত বৈশিষ্ট্য : তীব্রতা (উজ্জ্বল রং, তীব্র শব্দ ইত্যাদি), বিস্তৃতি, পুনরাবৃত্তি, অভিনবত্ব, গতিশীলতা, আকস্মিকতা, পরিবর্তন, স্পষ্টতা, বস্তুর আকৃতি, বস্তুর অবস্থিতি ইত্যাদি।

(b) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য : প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, আগ্রহ, অভ্যাস, মনঃপ্রকৃতি, সেন্টিমেন্ট, মনোভাব ইত্যাদি।

সুতরাং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে তথ্যগুলি সংবেদন স্তর থেকে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে যাওয়ার পথে নির্বাচিত হয় এবং প্রাথমিকভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(ii) ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে স্থায়ী স্মৃতিতে তথ্যের পরিচালন : ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে স্থায়ী স্মৃতিতে অভিজ্ঞতার সঞ্চালনের জন্য ব্যক্তি মূলত দুটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এই দুটি প্রক্রিয়া হল—

(a) পুনরাবৃত্তি (Rehearsal) : পুনরাবৃত্তির দ্বারা কোনো তথ্যকে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি থেকে স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত করা যায়।

(b) বিস্তৃতিমূলক সাংকেতীকরণ (Elaborative Encoding) : বিস্তৃতিমূলক সাংকেতীকরণের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির তথ্য অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়।

ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির তথ্যকে দু-প্রকার সংকেতের দ্বারা স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত করা যায়। এগুলি হল—

(a) কল্পসংকেত (Imagery) : বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মানুষের মনে যে কল্প বা ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয় তা স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

(b) বিমূর্ত ভাষামূলক সংকেত (Verbal Encoding) : বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তব বস্তুর কল্প হিসেবে সংরক্ষণ করা যায় না। এক্ষেত্রে ভাষামূলক সংকেত ব্যবহৃত হয়।

ভাষামূলক সাংকেতীকরণ আবার দু-ভাবে ঘটে। এগুলি হল—

(a) স্বাভাবিক ভাষামূলক সংযোগী (Natural Language Mediator) : এক্ষেত্রে তথ্যকে কোনো অর্থপূর্ণ ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

(b) বিন্যাসকরণ (Organisation) : এক্ষেত্রে ব্যক্তি কতগুলি তথ্যের ক্ষেত্রে একটি অর্থ আরোপ করে তার ভিত্তিতে সেগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করে এবং তা স্থায়ী স্মৃতিতে ধরে রাখে।

(iii) স্থায়ী স্মৃতি থেকে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্যের পরিচলন:

- ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির যেসব তথ্যগুলির মানসিক কল্প গঠিত হয় অথবা যেগুলির যথাযথভাবে সাংকেতীকরণ সম্ভব হয়, সেগুলি স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে সংরক্ষিত থাকে।
- ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে স্থায়ী স্মৃতি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি বা কার্যকরী স্মৃতিতে আনা যায়।
- স্থায়ী স্মৃতিতে অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয় কল্পের মাধ্যমে বা সাংকেতীকরণের মাধ্যমে।

এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দু-প্রকার কৌশলের মাধ্যমে তথ্যের পুনরুদ্রেক হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্য পৌঁছোবার পর সেগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। সেগুলি হল—

- **অর্থগত স্মৃতি (Semantic memory) :** এখানে ধারণা, শব্দ সম্পর্কিত তথ্য সঞ্চিত থাকে। যেমন—'গ্রহ', 'গাছ' প্রভৃতির তথ্য।
- **পর্যায়ক্রমিক স্মৃতি (Episodic Memory) :** এটি হল বিভিন্ন ঘটনা যা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে সেগুলির স্মৃতি।

এখানে কোনো যৌক্তিকতার ভিত্তি থাকে না। যেমন— কেউ একজন বেড়িয়ে এসে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কী কী দেখেছিল তার বিবরণ দিতে পারে।

প্রক্রিয়াগত স্মৃতি (Procedural Memory) : কোনো একটি কাজ বা প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই সম্পর্কিত তথ্য এখানে সঞ্চিত থাকে, যেমন—কীভাবে গাড়ি বা কম্পিউটার চালাতে হয় তা স্মৃতিতে রাখা।

চিত্রগত স্মৃতি (Photographic Memory) : কোনো ছবি বা চিত্র সম্বন্ধীয় তথ্য এই স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে।

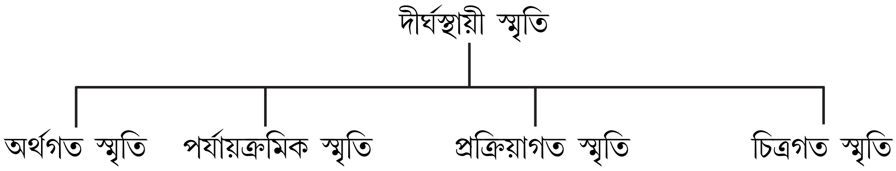

পুনরুদ্রেক যেহেতু একটি সৃজনমূলক প্রক্রিয়া, তাই অভিজ্ঞতার সাংকেতীকরণ থেকে পুনরুদ্রেক করলে যত তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয় তাকে সব সময় প্রয়োজনমত অস্থায়ী পুনরুদ্রেক করা যায় না।

১০.৫ বিস্মৃতি, বিস্মৃতির কারণ (Forgetting and Causes of Forgetting)

১০.৫.১ বিস্মৃতির ধারণা (Concept of Forgetting)

বিস্মৃতি হল পূর্বে শেখা, সংরক্ষিত করা এবং অভিজ্ঞতা হিসেবে সঞ্চয় করা কোনো বিষয় বা ঘটনাকে মনে করতে ব্যর্থ হওয়া, আমরা স্মরণক্রিয়াতে দেখতে পাই প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে একসঙ্গে অনেক বিষয় বা তথ্যকে সেন্সরি রেজিস্টারে গ্রহণ করি। এই তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষ বা নির্বাচিত কিছু অংশ স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং অধিকাংশ গুলিই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়।

Aristotle মনে করেন, "বিস্মৃতি হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্চার অভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা মুছে যাওয়া।"

Goddard বলেছেন, "সংরক্ষণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে এবং ঋণাত্মক সংরক্ষণই হল বিস্মৃতি।"

Drever বলেছেন, "বিস্মরণ হল কোনো সময়ে পূর্বে জ্ঞাত কোনো অভিজ্ঞতাকে মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থতা বা পূর্বে শেখা কোনো কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতা।"

Munn (1967) মনে করেন, "পূর্বে অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং মনে করায় ব্যর্থতাই হল বিস্মরণ।"

K. Morgan and Robinson (1981) বলেছেন দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে বিস্মৃতি হওয়া বলতে বোঝায় জমা হওয়া তথ্য থেকে বিষয়বস্তুর বিলীন হওয়া।

১০.৫.২ বিস্মৃতির কারণ (Causes of Forgetting)

বিস্মৃতি কেন ঘটে—এ নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এখানে কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করবো যেগুলি ভুলে যেতে সাহায্য করে।

প্রথমত, ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে সকল শর্তগুলির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যদি আমরা না মেনে চলি তাহলে আমাদের ভুলে যাওয়ার হার বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, আরো কতগুলি কারণ আছে যা ভুলে যাওয়ার পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়।

(১) বোধহীন শিখন (Rote Learning) : বোধহীন শিখনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ খুব নিম্নস্তরের। এ কারণে বিস্মৃতি ঘটে বেশী এবং খুব তাড়াতাড়ি। অর্থহীন শব্দতালিকা, সংখ্যা বা অক্ষরের তালিকা মুখস্থ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সীমাবদ্ধতা আছে।

(২) পুনরাবৃত্তির অভাব (Lack of review) : বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর তার যথাযথ চর্চা বা পর্যালোচনা করা না হলে সেই বিষয়টির বিস্মৃতি বা বিলুপ্তি ঘটে।

(৩) ক্লান্তি (Fatigue) : শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্লান্তিই বিস্মরণের অন্যতম কারণ।

(৪) বাধা (Interference) : পরীক্ষার আগে যখন শিক্ষার্থী অনেক বিষয় বা ধারণা একসঙ্গে শেখে ও মনে করার চেষ্টা করে তখন দেখা যায় একটি বিষয় বা ধারণা অপর বিষয় বা ধারণাকে স্মৃতিতে আনতে বাধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করছে। এই বিষয়টিকে বলে বাধা। এই বাধা দু-ধরনের হতে পারে।

পশ্চাদ্‌মুখী বাধা (Retroactive Interference) : পরবর্তীতে শেখা কোনো বিষয় যখন পূর্ববর্তী শেখা বিষয়কে ভুলিয়ে দেয় বা স্মৃতিতে বাধা সৃষ্টি করে তখন তাকে পশ্চাদ্‌মুখী বাধা বলে। যখন কোনো শিশু নতুন কোনো ছড়া মুখস্থ করে তখন পুরোনো ছড়াটি তার মনে করতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ নতুন ছড়া পুরোনো ছড়াকে স্মরণ করতে বাধা সৃষ্টি করছে।

অগ্রমুখী বাধা (Proactive interference) : পূর্বে শেখা বিষয় বা ধারণা বর্তমানে শেখা বিষয়কে

বা ধারণাকে স্মরণ করতে বাধা সৃষ্টি করে। এই ঘটনাকে বলে অগ্রমুখী বাধা।

এই বাধা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—

অ্যামনেশিয়া (Amnesia) : কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্মৃতিভ্রংশ হলে তা বিষয়বস্তুকে স্মৃতিতে ধারণে বাধা দেয়।

আবেগজনিত বাধা (Emotional blocking) : রোগ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদির মতো প্রক্ষোভের জাগরণে ব্যক্তির স্মৃতি থেকে অনেক অভিজ্ঞতা বিলুপ্ত হতে পারে।

মনোযোগ ও আগ্রহের অভাব (Lack of attention and interest) : মনোযোগ ও আগ্রহব্যতীত আয়ত্ত করা বিষয় মানুষ দ্রুত ভুলে যায়।

সমন্বয়ের অভাব (Lack of association) : শিখন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় না থাকলে তা দ্রুত বিস্মৃতির কারণ হতে পারে।

অসুস্থতা ও অবসাদ (illness and fatigue) : অসুস্থ ও ক্লান্ত মন নিয়ে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করলে তা স্থায়ী হয় না।

মাদকের প্রভাব (Effect of drug) : নেশাজাতীয় বস্তু গ্রহণের ফলে বিস্মৃতি ঘটে থাকে।

বয়স বৃদ্ধির জন্য (Due to old age) : একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর মানুষের স্মৃতিতে ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়।

ওষুধের ক্রিয়া (Reaction to Medicine) : অনেক সময় খুব বেশি উত্তেজক ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে খেলে মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলি দুর্বল হয়। ফলে বিস্মৃতি ঘটে।

পরিবেশের পরিবর্তন (Chage of Environment) : আমরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করি। অনেক সময় বিশেষ পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটলে আমরা বিষয়টি ভুলতে পারি।

১০.৬ সারাংশ (Summary)

মনোবিদ টেলফোর্ড (Telford)-এর মতে শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হয় আর পরিবর্তিত আচরণকে আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখি। পরবর্তীকালে যা অভিজ্ঞতা হিসেবে পুনরায় শিখনে সাহায্য করে থাকে। অনেকে আবার স্মৃতিকে মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

স্মরণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর উপাদান হিসেবে শিখন (Learning), ধারণ (Retention), পুনরুদ্রেক (Recall) এবং প্রত্যাভিজ্ঞাকে (Recognition) চিহ্নিত করে থাকি। মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতির প্রকৃতি ও কার্যকারীতা অনুযায়ী স্মৃতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।

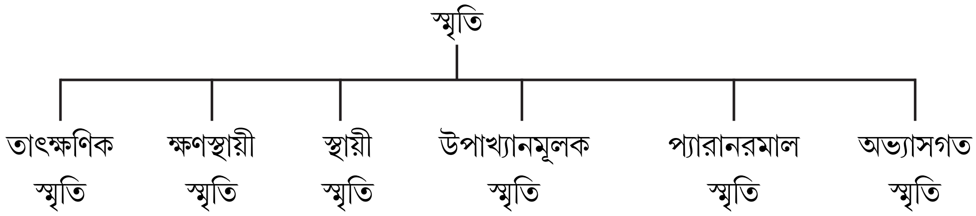

স্মৃতির কাজ হল সংরক্ষিত বিষয়কে পুনরায় ব্যবহার বা পুনরুদ্রেক করা। এটি তথ্যকে সংকেত যুক্তকরণ করে থাকে। এটি এক ধরনের প্রজ্ঞামূলক বিষয়। মনোবিদ্‌গণ স্মরণক্রিয়ার তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।

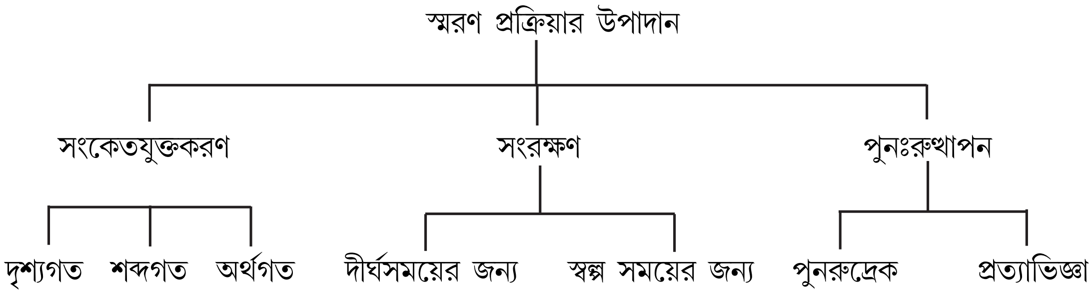

মানুষের স্মরণক্রিয়াকে কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কম্পিউটারে যেমন Input-Process-Output রয়েছে। তেমনি মানুষের স্মরণ ক্রিয়াতেও তিনটি প্রক্রিয়া কাজ করে। মানুষের তথ্য প্রক্রিয়াকরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেলটি অ্যাটকিনসন ও সিফরিন এর মডেলটি এই ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। যে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা বা শিখন থেকে স্মৃতির পরিমাণকে বাদ দিলে বিস্মৃতি ঘটে। বিস্মৃতির কারণগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যিক। ফলত এখানে কারণগুলো আলোচিত হয়েছে।

১০.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. স্মৃতি ও বিস্মৃতির সংজ্ঞা দিন।

২. স্মৃতির উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

৩. বিস্মৃতির প্রচলিত কারণগুলির বর্ণনা দিন।

৪. স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি কি?

৫. মানুষের তথ্যপ্রক্রিয়াকরণের মূল দিকগুলি কি কি?

৬. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত Alkinson এবং Shiffrin এর মডেলটি আলোচনা করুন।

৭. শিক্ষায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের তাৎপর্যগুলি কি কি?

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

Nath, D.C., Bhatt, N.K., (2022), Study Material, PG Education, Paper-2 (Beng) Modules: 1 & 2, NSOU, Kolkata.

ঘোষ, সনৎ কুমার., শিখনে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (২০১৪), ক্লাসিক বুক্স, কোলকাতা।

Pal, D., Pal, A., Pandey, P., (2018) Educational Psychology, Rita Publication, Kolkata.

একক ১১ ❑ মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention and Interest)

গঠন **(Structure)**

১১.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১১.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১১.৩ মনোযোগের ধারণা **(Concept of Attention)**

১১.৪ মনোযোগের নির্ধারক ও তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ **(Determinant of Attention and classroom applications)**

১১.৫ আগ্রহ **(Interest)**

১১.৫.১ আগ্রহের ধারণা **(Concept of Interest)**

১১.৫.২ আগ্রহের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান **(Factors affecting Interest)**

১১.৫.৩ শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ **(Classroom application)**

১১.৬ সারাংশ **(Summary)**

১১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- মনোযোগের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মনোযোগের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মনোযোগের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত নির্ধারক শর্তগুলির বর্ণনা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।
- মনোযোগের আধুনিক মতবাদ বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।
- আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।

১১.২ ভূমিকা (Introduction)

মনোযোগ মানুষের প্রজ্ঞামূলক মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনোযোগের স্বল্পতাজনিত ব্যধি ভিন্ন কারণে আলোচিত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিক্ষা প্রক্রিয়া সঠিক হলে বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি সঠিকভাবে প্রযুক্ত হলে মনোযোগের কোনো স্বতন্ত্র গুরুত্ব নেই। মনোবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে মনোযোগ ছিল একটি প্রধান চর্চার বিষয়। অনেক সময় মনোযোগকে প্রায় চেতনার সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। এখনও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ অন্যতম চর্চার বিষয়। কিন্তু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে এর স্থান সংকুচিত। আলোচ্য পাঠ্যাংশটিতে মনোযোগ সংক্রান্ত পুরানো ধারণাগুলি উল্লেখ করা হবে। সবশেষে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে। আধুনিক মনোবিদগণের মতে মনোযোগ মানসিক শক্তি নয়, মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। অনেকে বলেন মনোযোগের ফলে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবার আগ্রহ সৃষ্টি হলে আগ্রহের বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মানুষ কোনো কাজে কতটা মনোযোগ দেবে কত ভালোভাবে তার প্রক্রিয়াকরণ করবে, উপলব্ধি করবে ও মনে রাখবে—সবই নির্ভর করে কাজটির প্রতি ব্যক্তির আগ্রহের উপর। শ্রেণীকক্ষে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের করণীয় বিষয়গুলি নিচে আলোচিত হবে।

১১.৩ মনোযোগের ধারণা (Concept of Attention)

প্রতিদিন আমরা কত কিছু জিনিস প্রত্যক্ষ করি কিন্তু সব বিষয়েই সমানভাবে মনঃসংযোগ দিতে পারি না। নির্বাচিত কিছু বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসে তার প্রতি মনোনিবেশ করি। একেই আমরা সাধারণভাবে মনোযোগ হিসাবে মনে করি। প্রাচীন মনোবিদগণের মতে মনোযোগ হল একটি মানসিক শক্তি, চর্চার সাহায্যে যার শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। আধুনিক মনোবিদগণের মতে মনোযোগ মানসিক শক্তি নয়, মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মনোযোগ একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া বা অবস্থা যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি, ততক্ষণ কোনো না কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, মনোযোগ হল ইচ্ছামূলক মানসিক সক্রিয়তা যা মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। মনোবিদ ম্যাক্‌ডুগাল (Mc dougall) বলেছেন মনোযোগ হল এমন এক প্রকার মানসিক সক্রিয়তা যা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যখন কোনো উদ্দীপনাতে মনোযোগ দিই তখন আমরা অনেক উদ্দীপকের প্রতি অমনোযোগী হই। মনোযোগ হল নির্বাচনভিত্তিক প্রতিক্রিয়া।

অতএব আমরা বলতে পারি যে ধরণের প্রত্যক্ষণের প্রক্রিয়ায় আমরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আমাদের সচেতনাকে কেন্দ্রীভূত করি, তাকেই মনোযোগ বলা হয়।

১১.৪ মনোযোগের নির্ধারক (Determinants of Attention), ও তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ (Classroom Application)

মনোযোগ একটি নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়া। যে শর্তগুলি মনোযোগের বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করে সেইগুলিকে সাধারণভাবে মনোযোগের নির্ধারক বলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মনোযোগের দু-প্রকার নির্ধারক দেখা যায়।

(১) ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা বাহ্যিক (Objective or external)

(২) ব্যক্তি সাপেক্ষ বা আভ্যন্তরীণ (Subjective or internal)

বস্তু বা উদ্দীপকের কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য যখন আমরা মনোযোগী হই তখন সেগুলিকে বলা হয় বস্তুগত নির্ধারক। এই বস্তুগত নির্ধারকগুলি হল—

- তীব্রতা (Intensity) : উদ্দীপকের তীব্রতার কারণে মনোযোগ আকর্ষণ বেশী হয়। যেমন তীব্র আলো বা উচ্চ শব্দ সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- বিস্তৃতি (Size or Extensity) : বড়ো জিনিস আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে।
- পুনরাবৃত্তি (Repetition) : উদ্দীপকের বারবার উপস্থিতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন—দরজায় একটা টোকা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু বারেবারে টোকা দিলে মনোযোগ সেদিকে যাবে।
- পরিবর্তন (Change) : হঠাৎ কোনো পরিবর্তন সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটি ক্লাসে সবাই স্কুল ইউনিফর্ম পরে এসেছে, একজন মাত্র পরে নি। তার দিকে সহজে মনোযোগ যাবে।
- নতুনত্ব (Novelty) : কোনো বিষয়ের নতুনত্ব বা অভিনবত্ব থাকলে সহজেই সেদিকে আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি।
- বিপরীতধর্মিতা (Contrast) : বিপরীতধর্মিতার জন্য মনোযোগ আকর্ষিত হয়। যেমন—সমস্ত স্বাভাবিক লেখার মধ্যে মোটা হরফে লেখা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- স্থায়িত্ব (Duration) : উদ্দীপকের স্থায়িত্বের উপরও আমাদের মনোযোগ নির্ভর করে। যেমন—কোনো গান যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তাহলে তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই।
- উজ্জ্বলতা : যে বস্তু যত বেশী উজ্জ্বল সেই বস্তু তত বেশী করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেই জন্যই বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এত উপযোগীতা।
- গোপনীয়তা : গোপনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ বেশী হয়। তাই গোপন কথা শোনার লোকের অভাব হয় না।

- গতিশীলতা : স্থির বস্তু অপেক্ষা গতিসম্পন্ন বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহরে বড়ো বড়ো গতিশীল বৈদ্যুতিক আলোর বিজ্ঞাপনগুলো সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- অদ্ভুত বা ব্যতিক্রমী : এই ধরনের চেহারার বস্তু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সার্কাসের জোকারেরা যেমন আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।
- অবস্থিতি (Position) : কোনো বস্তুর বিশেষ অবস্থানও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খবরের কাগজের ভিতরের পাতাগুলি থেকে আমরা প্রথম পাতার উপরই বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকি।
- বিচ্ছিন্নতা (Isolation) : একটি বস্তুকে যদি অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করে রাখা হয় তাহলে সেটির প্রতি আমাদের নজর পড়ে। অর্থাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন বস্তু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ব্যক্তিরসাপেক্ষ/আভ্যন্তরীণ মনোযোগ : ব্যক্তির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে যেমন—

- প্রবৃত্তি (Instinct) : প্রবৃত্তির জন্য আমরা অনেক সময় কোনো বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই যেমন খিদে পেলে খাবারের দিকে মনোযোগ যায়। এটিকে বলে আরোপিত (enforced) মনোযোগ।
- প্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট ও মনপ্রকৃতি (Emotion, Sentiment and temperament) : এগুলি হল স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ সৃষ্টিকারী নির্ধারক।
- অনুরাগ/আগ্রহ (Interest) : কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকলে সেটিতে আমরা সহজেই মনোযোগ দিই। যার খেলার প্রতি আগ্রহ আছে, যে টিভিতে চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে চ্যানেল পেলেই আকৃষ্ট হয় বা খবরের কাগজে খেলার খবর আসে মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- মনস্থির (Mind Set) : কোনো ব্যক্তি যদি পূর্বেই মনস্থির করে অর্থাৎ মনে মনে ঠিক করে নেয় যে মনোযোগ দেবে তবে মনোযোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। যেমন কেউ বলে আজকে 'আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-এর খেলা আছে, মনোযোগ দিয়ে দেখব। এক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে।
- সেন্টিমেন্ট (Sentiment) : এই জৈব-মানসিক প্রবণতার জন্য আমরা বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগী হই। মাঠে খেলতে খেলতে দু-তিনটি শিশু একসঙ্গে পড়ে গেলে মা তার নিজের সন্তানকে তোলার জন্য আগে দৌড়ে যায়।
- অভ্যাস (Habit) : অভ্যাস মনোযোগের একটি বিশেষ নির্ধারক। অভ্যাসজনিত কারণে আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তু নির্বাচন করে থাকি। যেমন—যাদের চা পানের অভ্যাস আছে তারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চা-এর খোঁজ করবে।
- মনোভাব (Attitude) : অতীত অভিজ্ঞতার দরুন কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে তা বস্তু নির্বাচনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

- কামনা (Desire) : কামনা, বাসনা, অভিপ্রায় বা মানসিক ইচ্ছা ব্যক্তির মনোযোগ নির্ধারণ করে। যে ব্যক্তি অর্থের কামনায় উন্মত্ত তার মনোযোগ সব সময়ই অধিক অর্থ-উপার্জন করার দিকে।

- অভিজ্ঞতা : পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের মনোযোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত উভয় প্রকার নির্ধারকই সম্মিলিতভাবে আমাদের মনোযোগের বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করে। তবে মনোবিদদের মতে মনোযোগের ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলিই মনোযোগের বস্তু নির্বাচনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। তাদের মতে ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলিই বস্তুগত নির্ধারক গুলিকে সক্রিয় করে তোলে। তাই তাঁরা ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলিকে বলেছেন মুখ্য নির্ধারক (Primary Conditions) এবং বস্তুগত নির্ধারকগুলিকে বলেছেন গৌণ নির্ধারক (Secondary Conditions)।

শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ (Classroom application) : শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাকালীন মানসিক সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে মনোযোগ। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষককে কিছু পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর মনোনিবেশ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শিক্ষায় সঠিক মনোনিবেশ স্থাপনই শিক্ষার্থীর জীবনে সফলতা নিয়ে আসে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করবেন।

- শিক্ষক এমন কোনো সংকেত ব্যবহার করবেন যার ফলে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে শিক্ষক তাকে মনোযোগ দিতে বলছে। যেমন—হঠাৎ চুপ করে যাওয়া বা ডাস্টার বা চক দিয়ে টেবিলে টোকা মারা ইত্যাদি।

- আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিখন উপযোগী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

- প্রাথমিক স্তরে শিশু প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়। এই স্তরে শিশু তার কৌতুহল, আত্ম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রবৃত্তির তাড়নায় যেসব বস্তুতে স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী হয় সেগুলিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এই স্তরে তাই খেলাধূলা, নাচ, গান, অঙ্কণ, হাতের কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

- একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলে চলবে না। জটিল বিষয়বস্তু হলে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

- আমরা জানি মনোযোগ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তাই বয়স উপযোগী পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে হবে।

- পাঠদানের উপযুক্ত শ্রেণী পরিবেশ তৈরী করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থী অমনোযোগী হয়ে উঠবে।

- মনোযোগ নির্ধারক শর্তগুলি যথা বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা, নতুনত্ব পুনরাবৃত্তি গতিশীলতা প্রভৃতির কথা মনে রেখে শিখন কার্য পরিচালনা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের সাহায্যে যথাযথ পাঠদান কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে।
- সর্বোপরি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োজন বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে তার প্রতি মনোনিবেশ স্থাপন করতে অভ্যাস প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষক যখন ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন, তা যেন স্পষ্ট ও বড় হয় যাতে লেখা বিষয়বস্তু সমস্ত শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- যেহেতু একইসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়া যায় না যেহেতু বিষয়বস্তুকে ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ সৃষ্টি করতে সুবিধে হয়।
- শিক্ষার্থীর নাম করে ডাকলে মনোযোগ দ্রুত আকর্ষণ করা যায়।
- শিক্ষক শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি কিছু অভিনবত্ব আনতে পারেন তাহলে মনোযোগ আকর্ষণের সুবিধে হয়।
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ প্রদীপন (teaching aids) ব্যবহারের ফলে শিখন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আসে, ফলে মনোযোগ আকর্ষিত হয়।
- শিক্ষক শিখনের সময় এমন কিছু প্রশ্ন করবেন যাতে শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল জাগে।
- নতুন বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর পুরানো ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে পড়ালে মনোযোগ ভালো হয়।
- শিখনের পূর্বে শিখন উদ্দেশ্যগুলিকে শিক্ষক আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিখনের পূর্বে ছোটো কিন্তু স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন।
- যখন শিক্ষক বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন তখন যেন তিনি বিকর্ষকগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন—মোবাইলের সুইচ বন্ধ করে দেওয়া।

  বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে কঠিন ও নীরস অথচ প্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় এবং ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে যাতে মনোযোগকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- মনোযোগের চঞ্চলতা ও পরিবর্তনশীলতা বিষয়ে শিক্ষক সচেতন হবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন এবং অভ্যাস ও আগ্রহ সৃষ্টি করে পরিবর্তনশীলতাকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক তার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বা তার বাচনভঙ্গী, গলার স্বর ইত্যাদি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করবেন।

- যে সব বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আসে না, সেইসব বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। পুনরাবৃত্তির সময় যাতে কোনোরকম একঘেয়েমি না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

  পুনরাবৃত্তি না করে বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

  শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল মনোযোগ। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার সময় সেইসব কৌশলগুলি অবলম্ব করবেন যা শিক্ষার্থীকে মনোযোগী হতে সহায়তা করবে।

১১.৫ আগ্রহ (Interest)

১১.৫.১ আগ্রহের ধারণা (Concept of Interest)

আগ্রহ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দটি হল 'Interest' যার অর্থ হল It matters বা it concerns অর্থাৎ আগ্রহ বলতে আমরা বুঝতে পারি বহির্জগতের কোনো বস্তু, যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। এই অর্থে আগ্রহ হল আগ্রহ জাগায় এমন বস্তু (object of interest)। দ্বিতীয় অর্থে আগ্রহ হলো একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের কাজের প্রকৃতিকে (nature of man's activity) প্রকাশ করে। তৃতীয়তঃ আগ্রহ বলতে বোঝায় মনের স্থায়ী প্রবণতাকে। (enduring disposition) ড্রিভার বলেছেন—''An interest is a disposition in its dynamic aspect'' অর্থাৎ অনুরাগ বা আগ্রহ হলো এক ধরনের মানসিক প্রবণতা, যে প্রবণতাকে আমরা মানসিক সংগঠনও (mental structure) বলে থাকি। ম্যাকডুগাল বলেছেন,—''যে সব বস্তু প্রাণীর প্রবৃত্তিগত প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত, সেইসব প্রবণতাই তার আগ্রহের বিষয়বস্তু। কোনো বস্তুর প্রতি প্রাণীর অনুরাগের পরিমাণও এই প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতার শক্তির সমানুপাতিক। মনোবিদ রস্ (Ross) বলেছেন—মানুষের অনুরাগ অভিজ্ঞতামূলক নয়, প্রেষণামূলক এবং আগ্রহ সৃষ্টির মূলে থাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ (Interest is conative rather than cognitive, the emotions must be organised round the objects of interest.

আগ্রহ বা অনুরাগ হল শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনুরাগ হল এমন একটি আভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে কোনো বিষয়, বস্তু বা কাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। আগ্রহ হল ব্যক্তির একটি স্থায়ী প্রবণতা যা ব্যক্তির সুপ্ত মনোযোগকে গতিশীল করে তোলে এবং বহুমুখী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আগ্রহ হল অর্জিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগেরও বিকাশ হতে থাকে। শিশুর অনুরাগ তার সমাজ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। শিশুর আগ্রহ অনেক সময় তাকে নতুন কিছু সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে। সৃজনশীল ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নতুন সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ।

১১.৫.২ আগ্রহের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors affecting of Interest)

যে সব বিষয় (factor) মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির ওপর প্রভাব ফেলে সেগুলিকে ব্যক্তিগত (Subjective) ও বস্তুগত (Objective) এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হ'ল—

ব্যক্তিগত বিষয় :

- **চাহিদা (Need) :** ব্যক্তির অধিকাংশ বিষয়গত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত। যে কাজে ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয় তার প্রতি আগ্রহ অধিক সৃষ্টি হয়।
- **মনোভাব (Attitude) :** কোনো বিষয়ের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব ওই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।
- **সক্ষমতা (Ability) :** ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা তাকে কোনো কাজে নিয়োজিত হতে আগ্রহী করে তোলে।
- **সাফল্য (Success) :** পূর্ব কাজের সাফল্য পরবর্তী কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

বস্তুগত বিষয় :

- **আকৃতি (Size) :** কোনো বস্তুর আকৃতি স্বাভাবিকের তুলনায় আকৃতিতে বড়ো বা ছোটো হলে তার প্রতি আমরা আগ্রহ দেখাই।
- **অবস্থান (Place) :** বিষয়বস্তুর বিশেষ স্থানে অবস্থান ওই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করে।
- **সমন্বয় (Coordination) :** এক বা একাধিক বিষয় বা বস্তুগত সমন্বয়ে অভিনব কোনো বিষয় তৈরি হলে তার প্রতি আমরা আগ্রহী হই।
- **পরিবেশগত পরিবর্তন (Environmental Changes) :** আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশের কোনো বিশেষ পরিবর্তন হলে তার কারণ জানতে আমরা আগ্রহী রই।

১১.৫.৩ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ (Classroom Application)

শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বা শিখন অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকা দরকার। শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কিছু কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

- শিখন বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কিছু কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয়, শখ, সহপাঠক্রমিক বিষয় ইত্যাদি নির্বাচন/চিহ্নিত করে শ্রেণীকক্ষে পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রসাত্মবোধ ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নির্দেশনা দান করতে পারেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোটো আকর্ষণীয় গল্প উপস্থাপন করতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বিষয়বস্তুর প্রকৃত উৎসকে আকর্ষণীয় ও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
- শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সামনে বিস্ময়কররূপে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল বৃদ্ধি করতে পারেন। এভাবে তাদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব।
- পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়টি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলে এবং সেই অনুযায়ী পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব।
- শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা, আলো, হাওয়া যথোপযুক্ত থাকলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে সুবিধা হবে।
- শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথ পরিচালিত করলে, তারা ঠিক পথে এগোতে পারবে।
- খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলিকে এক সাথে আনতে পারলে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হতে সহজ হয়।
- শিক্ষণীয় বস্তু বাস্তবসম্মত হলে শিখন ফলপ্রদ হয়।
- শিক্ষকের কাজের প্রতি আগ্রহ, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আগ্রহ, সৃষ্টিশীল মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জন্মাতে ও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে।
- মনস্তাত্ত্বিক নীতির ওপর ভিত্তি করে শিখন অভিজ্ঞতাগুলি পরিচালিত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি, আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি ও আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য তাদের প্রশংসা করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অনুরাগ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিখন ও মনোযোগের শর্ত হিসেবে আমরা অনুরাগের কথা বলছি। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর অনুরাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা অনুরাগ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিয়ে শিক্ষক তাদের বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারেন। সবশেষে শিক্ষার্থীদের পাঠে বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে শিক্ষকের নিজস্ব অনুরাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১১.৬ সারাংশ (Summary)

মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার পিছনে যে মানসিক সক্রিয়তা কাজ করে তাই হলো মনোযোগ। উদ্দীপকের কতগুলি বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর এই মনোযোগ নির্ভর করে মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। মনোযোগ কেন ঘটে এবং কী কী কারণে আমাদের মন বিশেষ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয় সেই কারণগুলিও এখানে আলোচিত হয়েছে। শিক্ষায় মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ্যপুস্তক উত্তমরূপে আয়ত্ত করা কখনই সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর

মনোনিবেশ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীর শিখনে মনোযোগ সৃষ্টি করতে কয়েকটি কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে।

আগ্রহের মূলে আছে কোনো একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছা। যখন কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ তার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয় তখনই সে সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এই অধ্যায়ে আগ্রহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। মনোবিদরা মনে করেন ব্যক্তির মনোযোগের প্রধান পরিচালক হলো আগ্রহ। আগ্রহ থাকলেই মনোযোগ আসবে কিন্তু মনোযোগ স্থাপিত হলেই যে তাতে আগ্রহ থাকবে এ কথা সব সময় সত্য নয়।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষকের লক্ষ্য হলো শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর প্রতি শিশুর মধ্যে প্রীতিকর স্থায়ী আগ্রহের সঞ্চার করা যাতে শিশু নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উদ্দীপিত হয়।

১১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. মনোযোগের সংজ্ঞা দিন।

২. মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩. মনোযোগের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৪. মনোযোগের নির্ধারকগুলি কি কি?

৫. শিক্ষায় মনোযোগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬. আগ্রহের সংজ্ঞা দিন।

৭. শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৮. আগ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Pal, D., Pal, A., Pandey, P., (2018), Educational Psychology, Rita Publication, Kolkata.

ঘোষ, সনৎ কুমার, শিখনে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (২০১৪), ক্লাসিক বুক্‌স, কোলকাতা

Banerjee, J., Nag, S., Dutta, G., Psychology of Learning and instruction (2007), Rita Book Agency, Kolkata.

Nath, D.C., Bhatta, N.K., (2022) Study Material PG Education, Paper-2 (Beng) Modules : 1 & 2, NSOU, Kolkata

একক ১২ ❑ প্রেষণা (Motivation)

গঠন **(Structure)**

১২.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১২.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১২.৩ প্রেষণা—ধারণা, শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য **(Motivation-Concept, Types, Characteristics)**

১২.৩.১ প্রেষণার ধারণা **(Concept of Motivation)**

১২.৩.২ প্রেষণার শ্রেণীবিভাগ **(Types of Motivation)**

১২.৩.৩ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Motivation)**

১২.৪ প্রেষণার তত্ত্বসমূহ **(Theories of Motivation)**

১২.৪.১ ম্যাসলো এর আত্মপ্রকাশ সংক্রান্ত তত্ত্ব **(Maslow's theory of self actualisation)**

১২.৪.২ বার্ণাড ওয়াইনারের কারণ নির্দেশক তত্ত্ব **(Weiner's Attributon Theory)**

১২.৪.৩ ম্যাক্‌ক্লিল্যাণ্ডের প্রেষণার তত্ত্ব **(Mc-clelland's Theory of Motivation)**

১২.৪.৪ জন্ এ্যাটকিনসনের সাফল্যলাভের প্রেষণার তত্ত্ব **(John Atkinson's Theory of achievement Motivation)**

১২.৫ প্রেষণার প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান **(Factors affecting Motivation)**

১২.৬ সারাংশ **(Summary)**

১২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

১২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেষণার প্রবৃত্তিবাদী তত্ত্ব বলতে পারবেন।

- প্রেষণার আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বলতে পারবেন।
- প্রেষণার কারণ নির্দেশক তত্ত্ব বলতে পারবেন।

১২.২ ভূমিকা (Introduction)

যে কোনো প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর কাছে সেটা অর্জন করার জন্য একটা আভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা তাগিদ কাজ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আচরণটি সম্পন্ন হবে না বা আচরণের মধ্যে একটা সংহতি বা ধারাবাহিকতা আসবে না। পাখিরা বাসা বাঁধে, প্রাণীরা খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, হস্তিমুখের দখল নেওয়ার জন্য দুই দাঁতাল হাতির লড়াই হয়, মানুষ সন্তান-প্রতিপালন করে, ছাত্রছাত্রীরা ফল ভালো করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এসব কাজ করার জন্য তাদের কেউ বড়ো একটা বাধ্য করে না, অন্তরের তাগিদে স্বেচ্ছায় তারা এই রকম অসংখ্য কাজ করে। এই আভ্যন্তরীণ তাগিদটা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কখনও শুধুই শারীরিক তাগিদ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা আবার কখনও আত্মরক্ষার তাগিদ, কখনও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পাওয়ার তাগিদ। এই তাগিদের সাধারণ নাম হল প্রেষণা (motivation)। প্রেষণার মূলে যে আভ্যন্তরীণ একটা শক্তি কাজ করে তা সকলেই স্বীকার করেছেন। Motivation শব্দটি লাতিন Moveer থেকে এসেছে। Moveer শব্দটির অর্থ 'To move' অর্থাৎ সচল প্রক্রিয়া। এর অর্থ আচরণগত পরিবর্তন। প্রেষণা ক্রিয়া লক্ষ্যাভিমুখী। শিখন উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া তাই উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে শিখনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

১২.৩ প্রেষণা-ধারণা, শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য (Motivation-Concept, Types and Characteristics)

১২.৩.১ প্রেষণার ধারণা (Concept of Motivation)

প্রেষণা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Movement' থেকে উদ্ভুত যার অর্থ হলো কোনো কিছুকে সঞ্চালিত করা। প্রেষণা হলো একটি আভ্যন্তরীণ শক্তি যা শিক্ষার্থীর প্রকাশ বা আচরণকে পরিচালিত করে। সাধারণ অর্থে প্রেষণা হল উদ্দেশ্যমুখী আচরণের সম্পাদনের প্রবণতা। অর্থাৎ প্রেষণা হল একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থা যা আমাদের বিশেষ একটি কাজে উদ্বুদ্ধ করে, কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী করে এবং লক্ষ্য অর্জন না করা পর্য্যন্ত আমাদের কাজে ব্যাপৃত রাখে। বিভিন্ন মনোবিদ প্রেষণা কী সেটা বোঝাতে দুটি ধারণার উল্লেখ করেন। একটি হল চাহিদা (need) এবং অপরটি হল তাড়না (drive)। চাহিদা হল কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তার অভাববোধ। তাড়না হল এক ধরনের উত্তেজনা, যা চাহিদা থেকে তৈরি হয়।

বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে মনোবিজ্ঞানে প্রেষণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন—

১. প্লেটো (Plato) বলেছেন, প্রেষণা এমন একটি আভ্যন্তরীণ শক্তি যার মূলে আছে মানুষের স্বাধীন চিন্তা।

২. ডেকার্তে (Descartes)-এর মতে ভাবাবেগই এর মূল কারণ।

৩. হবস (Hobbes) বলেছেন মানুষ নিজে তৃপ্ত হয় এমন আচরণ সে করে।

৪. হাচ্‌সন (Hutchson) বলেছেন, প্রেষণা দু-প্রকার—(ক) অহংবাদী-যা শুধুমাত্র নিজেকে আনন্দ দেয় এমন আচরণ। (খ) পরার্থবাদী-যে আচরণ অপরকে সুখ দেয় বা তৃপ্ত করে।

৫. মনোবিদ মাসলো (Maslow) এই ধারণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে চাহিদার একটি ক্রম নির্ণয় করেন। শারীরবৃত্তীয় চাহিদা থেকে ধাপে ধাপে তা আত্ম যথার্থীকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে পরিপূর্ণতার চাহিদাই সকল মানুষের কাম্য।

৬. মনোবিদ অ্যাটকিনসন (Atkinson) বলেছেন, প্রেষণা এমন একটি প্রবণতার অভিব্যক্তি যা এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।

৭. মনোবিদ উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) বলেছেন, প্রেষণা হল ব্যক্তির একটি অবস্থা বা গতি যা তাকে কোনো আচরণের জন্য এবং কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রযুক্ত করে।

৮. মনোবিদ সুইফট (Swift) প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য, যে পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া তার আচরণ ধারাকে সতত নিয়ন্ত্রণ করে তাই হল প্রেষণা। উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, প্রেষণা হল একটি অন্তর্গত সক্রিয় অবস্থার উদ্ভব যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মূল শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। এই আভ্যন্তরীণ শক্তি শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২.৩.২ প্রেষণার শ্রেণীবিভাগ (Types of Motivation)

কোনো কোনো মনোবিদ প্রেষণাকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

(১) জৈবিক (biological) প্রেষণা ও (২) মানসিক (psychological) প্রেষণা। কেউ আবার বলেছেন—অনর্জিত বা অস্তিত্বরক্ষার প্রেষণা (unlearned or survival) এবং অর্জিত বা সামাজিক প্রেষণা (learned or social) কারও মতে প্রেষণা দু-ধরনের—আভ্যন্তরীণ (in-trinsic) এবং বাহ্যিক (extrinsic)।

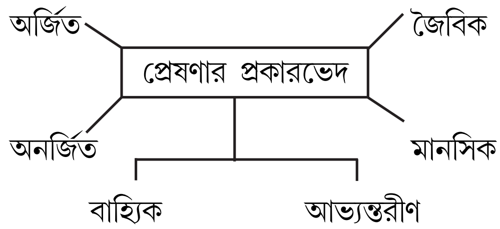

বাহ্যিক প্রেষণা হল এমন এক ধরনের প্রেষণা যা বাইরের কোনো কিছু দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেমন পুরষ্কার

বা শাস্তির জন্য যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আচরণ করে তখন বলা যেতে পারে এটি বাহ্যিক প্রেষণার ফল। যখন কোনো কিছু পাওয়ার আশায় কেউ কোনো কাজ বা আচরণ করে তখন সেখানে বাহ্যিক প্রেষণা কাজ করছে। বাহ্যিক প্রেষণা সাধারণভাবে কোনো বাহ্যিক উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে বাহ্যিক প্রেষণা সৃষ্টির জন্য যেগুলি ব্যবহার করে থাকি সেগুলি হল পুরস্কার, গ্রেড, বিশেষ সুযোগসুবিধা, প্রশংসা ইত্যাদি। বাহ্যিক প্রেষণা (শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশংসা ছাড়া) শ্রেণীকক্ষের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। অতিরিক্ত বাহ্যিক প্রেষণার ব্যবহার শিক্ষার্থীর আগ্রহকে নষ্ট করে। আভ্যন্তরীণ প্রেষণা (intrinstic motivation) বাহ্যিক প্রেষণার বিপরীত প্রক্রিয়া। মানুষ প্রত্যেকটি আচরণ কোনো কিছু পাওয়ার জন্য করে না। অনেক সময় মনের ইচ্ছেতেও কোনো আচরণ করে থাকে। এই ধরনের আচরণের পেছনে যে প্রেষণা কাজ করে তাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ প্রেষণা। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের আত্মসন্তুষ্টির জন্য কোনো আচরণ করে তখন আভ্যন্তরীণ প্রেষণা কাজ করে। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ি, অনেকে বিভিন্ন ধরনের গল্প, উপন্যাস পড়ি, অনেকে আবার টিভিতে সিনেমা বা সিরিয়াল দেখি—এগুলির ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রেষণাই দায়ী। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে আভ্যন্তরীণ প্রেষণা বাহ্যিক প্রেষণার থেকে বেশী কার্যকরী ও সুদূরপ্রসারী।

বিদ্যালয়ে বা শ্রেণীকক্ষে কোন্ ধরনের প্রেষণার ব্যবহার প্রয়োজন, প্রয়োজন অনুসারে দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে।

খেলাধূলা বা গানবাজনার ক্ষেত্রে পুরস্কার দান করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের গৃহকাজ দেখার পর প্রশংসা সূচক মন্তব্য দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষে কোনো প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিলে প্রশংসা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে এমন কিছু কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের পছন্দের কাজ করতে পারে। তাছাড়া লাইব্রেরীতে বিভিন্ন রকমের বই রাখা যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীদের আত্মতুষ্টি ঘটতে পারে। আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রেষণা লাভ করে।

প্রেষণার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে প্রেষণাকে শ্রেণীকরণ করা হয়।

- **শারীরিক প্রেষণা :** প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য প্রেষণাগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—খাদ্য, পানীয়, বাতাস, যৌনতা, শরীরের দূষিত পদার্থ নিঃসরণ, দেহের তাপ ইত্যাদি আবেগকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- **ব্যক্তিগত প্রেষণা :** আগ্রহ, মনোভাব, মূল্যবৃদ্ধি, আত্মসচেতনতা, আত্মপ্রকাশ—এই ধরনের প্রেষণা সকলের মধ্যে দেখা যায়।

  মনোবিদ ম্যাসলো বলেন, প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাকেই আত্মপ্রকট প্রেষণা বলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রেষণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
- **সামাজিক প্রেষণা :** ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনদর্শন সামাজিক প্রেষণাকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক প্রেষণার মধ্যে অন্যতম হল সামাজিক মর্যাদা। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আত্মসম্মান অর্থ ইত্যাদি। শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে সামাজিক প্রেষণার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

প্রেষণার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হল সচেতন প্রেষণা এবং অচেতন প্রেষণা। ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে চেতন প্রেষণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অবচেতন প্রেষণা যেহেতু বাহ্যিকভাবে ক্রিয়াশীল হয় না তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

১২.৩.৩ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য (Characteristics Motivation)

প্রেষণ প্রক্রিয়া একটি ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে শুরু হয়। চাহিদাগুলি হল জৈবিক চাহিদা বা মানসিক চাহিদা, সামাজিক চাহিদা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এগুলি মানুষের জৈবিক চাহিদা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদির মত চাহিদাগুলিকে আমরা মানসিক বা সামাজিক চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এইসব চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তাই প্রেষণ প্রক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে। পরিবেশ ও সমাজের প্রভাবে আমাদের প্রেষণা বা তার সঙ্গে যুক্ত প্রেষণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন না করলেও চলে। প্রেষণ প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির চাহিদা প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করলেও সম্পূর্ণভাবে চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

- **লক্ষ্য অভিমুখীনতা :** প্রেষণা ক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। যেকোনো প্রেষণাযুক্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। প্রেষণা ক্রিয়া চাহিদা থেকে শুরু হয় এবং সেই চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত্য এই ক্রিয়া চলতে থাকে।
- প্রেষণা শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং শিখনে আগ্রহকে ধরে রাখে।
- প্রেষণা শিখনের কর্মপদ্ধতিকে উজ্জীবিত করে।
- প্রেষণা আচরণের পথ নির্দেশ করে।
- প্রেষণা শিখনের কাজকর্মে শক্তি প্রদান করে।
- প্রেষণা শিখনে আত্মপ্রকাশকে পরিচালিত করে।
- প্রেষণা কাজ করার মনোভাব তৈরি করে ও ফলাফল উৎপাদন করে
- প্রেষণা শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পাদনে শক্তি জোগায় ও নিয়ন্ত্রিত করে।
- প্রেষণা হল শিখনের এক অভ্যন্তরীণ অবস্থা অথবা শর্ত।
- প্রেষণা একটি জীবের আচরণকে শক্তি প্রদান করে ও তাকে কর্মসক্ষম করে তোলে। প্রেষণা শুধুমাত্র আচরণকে পরিপুষ্ট করে তাই নয় তারা আমাদের কার্যের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আগ্রহকে ধরে রাখে।

- প্রেষণাগত আচরণ নির্দিষ্ট। প্রেষণা একটি জটিল বিষয় যা পরিবেশ ও কোনো একটি জীবের মধ্যে বহু পরিবর্তনশীল প্রভাবকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও প্রভাবিত হয়।
- লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ প্রেষণা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- প্রেষণ ক্রিয়া আমাদের জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।
- যেকোনো বিশেষ মুহূর্তে আমাদের প্রেষণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তিতে কাজ করে।
- প্রেষণা চাহিদা পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনে ভারসাম্য নিয়ে আসে। জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে জীবদেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা নিয়ে আসে। সমাজ জীবন ও সংগতিবিধানে সাহায্য করে থাকে। ফলরূপে জীবদেহের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয়।

চাহিদা → তাড়না → প্রেষণা → আচরণ → চাহিদার পরিতৃপ্তি → সন্তুষ্টি বিধান

Need → Drive → Motive → Behaviour → Need reduction → Satisfaction

প্রেষণার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে এই প্রক্রিয়া মানুষের বিভিন্ন আচরণকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু শিখন উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া তাই উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে শিখনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

১২.৪ প্রেষণার তত্ত্বসমূহ (Theories of Motivation)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিগত একশত বৎসরে প্রেষণার অনেক তত্ত্ব বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা পরিবেশন করেছেন। উইলিয়াম জেম্‌স ও ম্যাকডুগাল (William James and McDougall) যে তত্ত্বের কথা বলেন তার নাম সহজাত প্রবণতার তত্ত্ব (Instinct Theory)। তারপর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ভিত্তিতে, সামাজিক ভিত্তিতে এবং প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রেষণার। তার সবকিছু আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র চারটি তত্ত্বের কথা এখানে উল্লেখ করা হবে।

১২.৪.১ আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব (Theory of Self actualization) :

এই তত্ত্বের জনক আব্রাহাম ম্যাস্‌লো (Abraham Maslow)। তিনি তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self actualization) কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এর অর্থ ব্যক্তির সুপ্ত সক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহার। এই অর্থে আত্মপ্রতিষ্ঠা একটি বিকাশমূলক ধারণা। মানুষে পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে যে সব চাহিদা পূরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ম্যাস্‌লো তাদের কয়েকটি ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যাস করেছেন।

প্রথম স্তর, শারীরবৃত্তীয় চাহিদা (Physiological Needs) : ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদি চাহিদাগুলি এই নিম্নস্তরে প্রবল। এই চাহিদাগুলি না মিটলে মানুষের শক্তির অভাব ঘটে ও পরবর্তী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তার সক্রিয়তা ব্যাহত হয়। দুর্বল শরীরে শিখন সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় স্তর, নিরাপত্তার চাহিদা (Security Need) : এই চাহিদার স্থান শারীরবৃত্তীয় চাহিদার উপরে। নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সুস্থিতি, ভয় ও উদ্‌বেগ থেকে মুক্তি ইত্যাদি মানুষের আত্মরক্ষার ও সক্রিয়তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। যে ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয় শিক্ষক বা সহপাঠীদের ভয় পায় অথবা যাদের পরিবারের নিরাপত্তার অভাব আছে তাদের পড়া শেখায় ব্যাঘাত ঘটে।

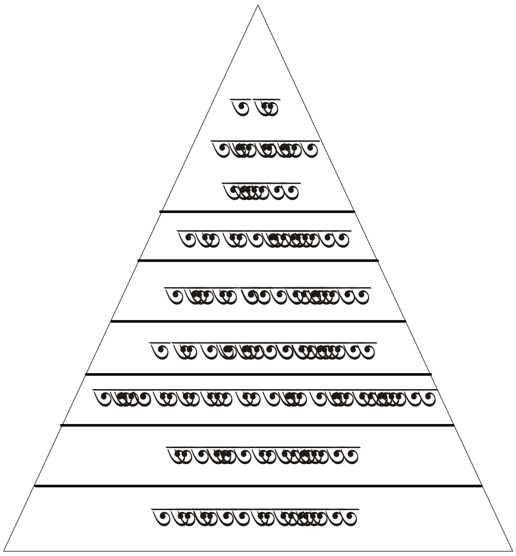

তৃতীয় স্তর, ভালোবাসা ও একাত্মতার চাহিদা (Need for love and belongingness) : পরিবার, স্বজন, বন্ধু ইত্যাদি ও তাদের সঙ্গে পারস্পরিক ভালোবাসার আদানপ্রদানের চাহিদা এই স্তরের অন্তর্গত। মানুষ একা থাকতে পারে না। একাকিত্ববোধ থেকে সৃষ্টি হয় সঙ্গলাভের চাহিদা। বিদ্যালয়, সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে একাত্মতাবোধ না করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থ স্তর, আত্মপ্রত্যয়ের চাহিদা (Self-esteem Need) : পূর্বোক্ত চাহিদাগুলি পূরণের মাধ্যমে, মানুষের নিজের সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। সে সচেতন হয় অন্যেরা যাতে তাকে যথেষ্ট মূল্য দেয় এবং নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, গুণাবলি ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা প্রত্যয় তাকে উদ্‌বুদ্ধ করে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে। শিক্ষার্থীরা এরই ফলে সাফল্যের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

পঞ্চম স্তর, জ্ঞানার্জনের চাহিদা (Need to Know) : এই স্তরে কি, কেন, কখন, কিভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজে মানুষ। সত্যানুসন্ধানে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ জ্ঞানান্বেষণ করে। 'যত দিন বাঁচি ততদিন শিখি' এই নীতির অনুসরণে আত্মতৃপ্তির জন্য মানুষের এই জ্ঞানান্বেষণ। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্যে শিক্ষালয়ে শিক্ষকের আশ্রয় নেয়।

ষষ্ঠ স্তর, নান্দনিক চাহিদা (Aesthetic Need)—মানুষ সুন্দরের পূজারী কেননা যা সত্য তাই সুন্দর এবং যা সুন্দর তা মঙ্গল প্রদায়ক। এই স্তরে মানুষ যা কিছু করে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে চায়, শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসংগঠিত ও সুসংহতভাবে করতে চায়। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের কাজ যাতে সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারে তার সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দেওয়া অত্যাবশ্যক। সহপাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়।

সপ্তম স্তর, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা (Self-actualization Need) : পূর্বোক্ত সমস্ত চাহিদা পূরণ হলেও মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে যায় যার ফলে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা কাল্পনিক চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মানুষের জীবনের অধিকাংশকাল জুড়ে তাকে সক্রিয়তায় নিয়োজিত রাখে।

১২.৪.২ বার্নার্ড ওয়াইনারের কারণ নির্দেশক তত্ত্ব (Weiner's Attribution Theory) :

সাফল্যের চাহিদা থাকা এবং সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, কখনও সাফল্য এবং কখনও ব্যর্থতা আসবে। বার্নার্ড ওয়াইনার (Bernard Weiner) তাঁর কারণ নির্দেশক তত্ত্বে বলেছেন, সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই হোক মানুষ চায় তার কারণকে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করতে। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তার ব্যর্থতার জন্য প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল, শিক্ষক আমাকে দেখতে পারেন না বা আমার পড়াটা ঠিকমত হয়নি এরকম একটা সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজতে চায়। এই কারণ নির্দেশ একটা আকস্মিক বা এলোপাতাড়ি ব্যাপার নয়। কারণ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও খাড়া করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়াও, একবার কারণ নির্দেশ করা হয়ে গেলে তা তাদের পরবর্তী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ছাত্র যদি মনে করে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের জন্যই তার ব্যর্থতা এসেছে, তবে শিক্ষকের প্রতি তার বিরাগমূলক আচরণ দেখা দেবে।

কারণ নির্দেশক তত্ত্ব সাফল্যের চাহিদার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ওয়াইনার মনে করেন সাফল্য লাভের চাহিদা জাগ্রত হলে আমরা যে ফলাফলই লাভ করি না কেন তাকে চারটি উপাদানের কোনো একটির সঙ্গে সংযুক্ত করি। এগুলি হল—

সক্ষমতা (Ability) : ছাত্র যদি বার বার ব্যর্থ হয় তবে কারণ হিসেবে সক্ষমতাকেই দায়ী করতে পারে। বার বার অঙ্কে ব্যর্থ হয়ে সে মনে করতে পারে অঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার (Mathematical ability) অভাব, তাই সে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এতে অঙ্কের প্রেষণা কমে এবং সে অঙ্কের জন্যে চেষ্টা করা থেকে বিরত হয়।

প্রয়াস (Effort) : ছাত্রের কোনো প্রাথমিক ধারণা থাকে না কতটা প্রয়াস কতটা সাফল্য এনে দেবে। ফলে সফল হলে সে মনে করে যারা তার থেকে কম সফল, তাদের থেকে সে বেশি প্রয়াসী হয়েছে আর এই জন্যই এসেছে সাফল্য। ফলে সে আরও বেশি প্রয়াসী হয়। এর দরুন একটা চক্রাকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাফল্য বৃদ্ধি করে পরবর্তী প্রয়াস, তাতে আসে আরও সাফল্য, তখন প্রয়াস আরও বৃদ্ধি পায়।

আকস্মিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও এই তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ভাগ্য (Luck) : যদি অর্জিত লক্ষ্য ও আচরণের মধ্যে কোনো বোধগম্য সম্পর্ক খুঁজে না পাওয়া যায় তখন ভাগ্যের দোহাই দেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এই কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। অপ্রত্যাশিত ভালো পরীক্ষার ফল বা খারাপ ফলের কারণ অনেক সময় এই ভাবেই নির্দেশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা।

নির্ধারিত কাজের কাঠিন্য (Task Difficulty) : সাফল্য ও ব্যর্থতার দ্বারা নির্ধারিত কাজের কাঠিন্য বিচার হয়। যদি অনেকে সফল হয় তবে মনে করা হয় কাজটি সহজ বা যদি অনেকে ব্যর্থ হয় তবে মনে করা হয় কাজটি কঠিন। যদি কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত সাফল্য লাভ করে তবে তার মনে হয় বিষয়টি সহজ। অনুরূপভাবে ক্রমাগত ব্যর্থ হলে মনে হয় বিষয়টি কঠিন।

১২.৪.৩ ম্যাক্ক্লিল্যান্ডের তত্ত্ব (McClelland's Theory of Motivation) :

ডেভিড ম্যাক্ক্লিল্যান্ড মারের (Murray) গবেষণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মারের গঠনমূলক পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি মানুষকে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক, মানুষের চাহিদা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও চাহিদার পরিমাপের দিকেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন মারের অনুপ্রেরণাতেই।

ম্যাক্ক্লিল্যান্ডের প্রথম দিককার গবেষণামূলক কাজে ব্যক্তিত্ব, প্রেষণা, প্রলক্ষণ (trait) এবং স্কিমা (Schema) ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাঁর মতে মানুষ যেভাবে আচরণ করছে তা কেন সেইভাবে করছে তার নির্ধারক হল প্রেষণা। মানুষ কীভাবে আচরণ করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তার নির্ধারক হল প্রলক্ষণ (trait)। স্কিমা হল পৃথিবী সম্বন্ধে ও ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে বিশেষ মনোভাব ও ধারণা। সংক্ষেপে বলা যায় প্রেষণা হল আচরণের কারণ, প্রলক্ষণ হল আচরণের কীভাবে প্রকাশ ঘটবে তার পদ্ধতি এবং স্কিমা হল নিজের ও অন্যের সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা।

প্রেষণা হল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস। প্রেষণাই ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণের মূল চাবিকাঠি। ম্যাক্ক্লিল্যান্ডের মতে বাহ্যিক জগতের উদ্দীপকসমূহ অনুষঙ্গের আকারে আমাদের অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গরম চুল্লি যে ভয়ের উদ্রেক করে তার কারণ অতি উত্তাপ যন্ত্রণাদায়ক। যে সকল কাজ সফলতার সঙ্গে অতীতে সম্পাদিত হয়েছে তাদের সঙ্গে সদর্থক অনুভূতি (গর্ব) জড়িত। তেমনি যে সকল কাজ ব্যর্থতা এনে দিয়েছে তাদের সঙ্গে নঞর্থক অনুভূতি (লজ্জা) জড়িত। আনন্দমিশ্রিত উদ্দীপক বা কাজের দিকে আমরা সোৎসাহে এগিয়ে যাই আর দুঃখ যন্ত্রণা মিশ্রিত উদ্দীপক বা কাজের থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিই। অর্থাৎ অতীতের অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণের দিক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর দ্বারা এটি বোঝায় না যে অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা বা আবেগই প্রেষণা বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় আবেগ হল প্রেষণার ভিত্তি।

উদ্দীপক ভবিষ্যৎ আনন্দ বা যন্ত্রণার নির্দেশ দেয়। যে ধরনের উদ্দীপক অতীতে আনন্দের সন্ধান দিয়েছে সেগুলির দিকে ব্যক্তি এগিয়ে যায় আর যে ধরনের উদ্দীপক অতীতে যন্ত্রণার উৎস হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে ব্যক্তি সেগুলির নিকট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। সংক্ষেপে প্রেষণা সম্পর্কে ম্যাক্ক্লিল্যান্ডের এই হল মূল বক্তব্য।

ম্যাক্ক্লিল্যান্ড প্রেষণার তত্ত্বকে যে মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন অনুভূতিমূলক সক্রিয়তার মডেল (Affective arousal model) হিসেবে। আচরণ করে 'আনন্দ পাওয়াই ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য' এই মডেলটিতে এই বক্তব্যটিই বিধৃত।

ম্যাকক্লিল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণার (Achievement motivation) ওপর। যে সকল ব্যক্তি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো রকম পুরস্কারের তোয়াক্কা না করে নিজের উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান (সাফল্যলাভের) প্রেষণায় তারা উচ্চস্তরের বলে পরিগণিত হন। উচ্চতর (সাফল্যলাভের) প্রেষণা সেই সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায় যে সব পরিবারে ছেলে মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রাথমিক ব্যর্থতায় মা-বাবা বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বিরক্ত না হয়ে বরাং ধৈর্য-সহকারে তাদের প্রচেষ্টা বারংবার চালিয়ে যেতে আদেশ উপদেশ দেন। অর্জন (সাফল্য লাভের) প্রেষণা সম্পর্কে ম্যাক্ক্লিল্যান্ডের বক্তব্যের এটি হল সারসংক্ষেপ। তাঁর মতে অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণা জন্মগত নয় বরং পরিবার ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেরণায় অর্জিত বিশেষ শক্তি—যে শক্তি ব্যক্তিকে উন্নীত করবে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে।

১২.৪.৪ জন্ অ্যাট্কিন্সনের (সাফল্যলাভের) তত্ত্ব (John Atkinson's Theory of Achievement Motivation) :

কোনো বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির কিছু অর্জন করার বিশেষ প্রবণতা নিয়ে জন্ অ্যাট্কিন্সনের এই তত্ত্ব। এখানে ব্যক্তি বিশেষভাবে অবগত যে তার কর্মসম্পাদন (অর্জন) একটা উৎকর্ষমানের কর্মসম্পাদনের সঙ্গে তুলনা করে তার কর্মের মূল্যায়ন করা হবে। উল্লেখ্য এখানে ব্যক্তি নিজেও তার মূল্যায়ন নিজেই করতে পারে। অ্যাট্কিন্সনের মতে অর্জন প্রবণতা নির্ভর করে যা ব্যক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করছে তাতে বিফল হলে তা কতটা দুঃখজনক হবে কিংবা তাতে সফল হলে তা কতটা আনন্দদায়ক হবে তার ওপর। অ্যাট্কিন্সন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অতি সহজ কাজে সফল হলে তা খুব একটা আত্মসন্তুষ্টির কারণ হয় না বা বিশেষ কিছু অর্জন করা হয়েছে বলে ব্যক্তির কাছে মনে হয় না। অপরপক্ষে অতি কঠিন কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এই তত্ত্বের সার কথা হল অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণার উচ্চস্তরে যারা অবস্থিত তারা এমন কাজ নির্বাচন করে থাকে যা অতি কঠিনও নয় আবার অতি সহজও নয় অর্থাৎ তারা মাঝামাঝি ধরনের কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। পক্ষান্তরে যারা অর্জন প্রেষণায় নিম্নস্তরে অবস্থিত তারা ব্যর্থতার ভয়ে ভীত। এরা এমন নিম্নমানের কাজে আত্মনিয়োগ করবে যাতে ব্যর্থতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই কিংবা এমন কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করবে যাতে ব্যর্থ হলেও অন্য কেউ তাদের নিন্দা করবে না।

১২.৫ প্রেষণায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (Factors affecting motivation)

আমাদের প্রেষণামূলক কাজের বা লক্ষ্যমুখী কাজের গতি কি কি শর্তের দ্বারা নির্ধারণ হল—এ নিয়ে মনোবিদদের বহু গবেষণা রয়েছে। এইসব গবেষণার ফল থেকে মনোবিদগণ কতগুলি শর্ত নির্দেশ করেছেন যেগুলি প্রেষণ প্রক্রিয়ার আচরণের গতি নির্ধারণ করে। এই শর্তগুলিকে বলা হয় প্রেষণ প্রক্রিয়ার নির্ধারক।

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক রয়েছে, কাজেই যে সমস্ত উপাদানগুলি প্রেষণার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায় সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রেষণা-নির্ধারক উপাদানগুলি হল—(১) উদ্‌বেগ (Anxiety) (২) কৌতূহল ও আগ্রহ (Curiosity and Interest) (৩) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Locus of Control) (৪) অর্জিত অসহায়ত্ব (Learned helplesness) (৫) আত্ম কার্যকারিতা (Self-efficiency) (৬) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ (Classroom environment)।

(১) উদ্‌বেগ (Anxiety) : শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা কারণে উদ্‌বেগ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন শিক্ষক, পরীক্ষা, সহপাঠী, সামাজিক সম্পর্ক, পারদর্শিতার লক্ষ্যমাত্রা, পছন্দসই বা অপছন্দের কোনো বিষয়, বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব ইত্যাদি। এই উদবেগের প্রভাব পড়ে তাদের পঠন পাঠনের উপর। এই উদবেগের মাত্রা কম বা মাঝারি ধরনের হলে তার প্রভাব হয় গঠনাত্মক কিন্তু উচ্চমাত্রার উদবেগের প্রভাব ক্ষতিকর। উদবেগের সঙ্গে অস্থিরতা, অবসাদ ও অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ যুক্ত থাকে।

সারাসন (Sarason) পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্‌বেগ (Test Anxiety) সংক্রান্ত কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

পরীক্ষার পরিস্থিতিকে ভীতিকর ও দুরুহ হিসেবে প্রত্যক্ষ করে, শিক্ষার্থী নিজেকে অসমর্থ মনে করে, ব্যক্তিগত অক্ষমতার ফলে অবাঞ্ছিত ফললাভের আশঙ্কা করে, ব্যর্থতা ও অপরের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ার আশঙ্কা করে। হেমব্রি (Hembree, 1988) উদ্‌বেগ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল থেকে কতগুলি সিদ্ধান্ত করেছেন—

পরীক্ষার উদ্‌বেগ ও পড়াশোনার সাফল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত আমাদের সমাজের সমস্ত স্তরেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য উদ্‌বেগ রয়েছে। মহিলাদের পুরুষ অপেক্ষা পরীক্ষার উদ্‌বেগ বেশী থাকে। বেশী সক্ষমতা বা কম সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তুলনায় মাঝারি সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উদ্বেগ বেশী তাকে। পরীক্ষার উদ্‌বেগ সরাসরি যুক্ত থাকে পরীক্ষার নেতিবাচক মূল্যায়ন পরীক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনুপযোগী পাঠাভ্যাস এর সঙ্গে।

(২) কৌতূহল : Brophy Good (1986) প্রমুখেরা তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন বৈচিত্রময় শিক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী বা কৌশল এবং কার্যপ্রণালী শিখনকে প্রভাবিত করে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপন এমনভাবে করা হতো যাতে করে ছেলেমেয়েদের কৌতূহলের সঙ্গে হাতে কলমে কিছু

করার সুযোগ পায়। প্রেষণাকে জাগাতে হলে জ্ঞান বা ধারণার ঘাটতি বা অভাবকে চিহ্নিত করে কৌতূহলকে উদ্দীপিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে বিষয় সম্পর্কে যত বেশী কৌতুহলী করা যাবে তারা তত বেশী পরিমাণে শিখতে পারবে।

(৩) আত্মকার্যকারিতা (Self-efficacy) : আত্মসক্ষমতা প্রেষণা নির্ধারকের একটি অন্যতম উপাদান। লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে আত্মসক্ষমতা প্রেষণাকে প্রভাবিত করে। আত্মসক্ষমতার উচ্চধারা প্রেষণায় শক্তি জোগায়। শিক্ষার্থীরা যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়, উচ্চাশা পোষণ করে, দৈহিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়তা পোষণ করে তবে তারা কম অবসাদগ্রস্ত হয়। সফলতার ক্ষেত্রে অধিক প্রেষিত হয়।

(৪) মূল্যবোধ (Values) : জীবনাদর্শ বা মূল্যবোধ কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যমুখী আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তির মধ্যে সঠিক জীবনাদর্শ গড়ে উঠলে ব্যক্তি সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে সচেষ্ট হয়। সক্রিয় হয় তার মধ্যে একটা প্রেষণা কাজে করে অর্থাৎ মূল্যবোধ বা জীবনাদর্শ প্রেষণ ক্রিয়ার অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

(৫) সফলতা (Success) : সফলতা ব্যক্তিকে কোনো কাজে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। ফলস্বরূপ ব্যক্তি পুনঃ শিখনে অনুপ্রাণিত হয়।

(৬) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Locus of Control) : আমরা কোনো আচরণের কারণ নিজের মধ্যেই নিহিত আছে বলে মনে করি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের কারণ হিসেবে বাইরের কাউকে দায়ী করি।

রটার (Rotter) আচরণ বা ঘটনার দুধরনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কথা বলেছেন—(১) বাহ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (২) অন্তঃ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। যখন কেউ বিশ্বাস করে তার পরীক্ষার ফলাপল ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, নিজস্ব সামর্থ্যের উপর নয়, তখন তাকে বলা হয় বাহ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আবার যখন শিক্ষার্থী মনে করে তার ফল খারাপ হয়েছে তার নিজস্ব প্রস্তুতি, দক্ষতা বা প্রচেষ্টার অভাবে তখন তাকে বলা হয় অন্তঃনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।

ড্যাসি (Dacey, 1989) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি হল—

(ক) শিক্ষকরা বাহ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রপ্রবণ শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিতে গুরুত্ব বেশী দেন।

(খ) বাহ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রপ্রবণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রত্যাশা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে ভালো ফল করতে পারে।

(গ) বাহ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রপ্রবণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় অন্তঃনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রপ্রবণ শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত তথ্যের অনুধাবন ও প্রয়োগে ভালো ফল দেখাতে পারে।

(ঘ) প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে অন্তঃনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রপ্রবণ শিক্ষার্থীরা বাহ্যনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রযুক্ত শিক্ষার্থীদের থেকে ভালো ফল করতে পারে।

(৭) অনুরাগ (Interest) : প্রেষণ ক্রিয়ার অন্যতম নির্ধারক হল অনুরাগ। লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুরাগের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে হবে তবেই শিক্ষার্থীরা সেই বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং কাজ করার প্রবণতা বা প্রেষণা সৃষ্টি হবে।

(৮) আকাঙ্খার স্তর (Level of aspiration) : আকাঙ্খার স্তর বা মাত্রা একজন ব্যক্তির কর্ম প্রবণতার গতিকেই নির্ধারণ করে। কেউ পরীক্ষায় শুধুমাত্র পাশ করতে চায় আবার কেউ ভালো নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগ পেতে চায়। অর্থাৎ সফলতার আকাঙ্খা অনুযায়ী পড়াশোনায় প্রেষণা জাগ্রত হবে।

(৯) উদ্বোধক (Incentive)) : বিভিন্ন ধরনের উদ্বোধক তা মূর্ত বা বিমূর্ত যাইহোক না কেন আমাদের প্রেষণা ক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থকরী করে তোলে। পুরস্কার, প্রশংসা, অর্থ বা যে কোনো আকর্ষণীয় বস্তু বা ঘটনা যা উদ্‌বোধকের কাজ করতে পারে। আর এইসব উদ্বোধক ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেষিত করে।

(১০) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ (Classroom Environment) : যেসব শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং শিক্ষকের সাহায্য লাভ করে তারা শিখনের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে যা তারা পরবর্তীকালে কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

কেন শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সহায়তা চায় না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

(ক) শ্রেণীকক্ষে সাহায্য চাওয়া বা না চাওয়ার মূলে রয়েছে শিক্ষার্থীর নিজের ক্ষমতা ও আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব।

(খ) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ যদি সহযোগীতা, দলগত উৎসাহ ও আস্থার সহায়ক হয় তবে শিক্ষার্থীর প্রেষণা বৃদ্ধি পাবে এবং শিখন ত্বরান্বিত হবে।

(১১) অর্জিত অসহায়ত্ব (Learned Helplessness) : যেসব শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে বার বার ব্যর্থ হয় তারা হতাশ হয়ে তাদের প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়, এই ধরনের অভিজ্ঞতা হল অর্জিত অসহায়ত্ব। রেপুচ্চি, ডুয়েক (Repucci, Dweek) গবেষণা কার্য চালানোর সময় দেখিয়েছেন, একদল ছাত্রকে এমন সমস্যা দেওয়া হল যা সমাধান করা যায় না এবং অপর দলকে সমাধান যোগ্য সমস্যা দেওয়া হল। কয়েকবার পরীক্ষা চালাবার পর উভয় দলকেই সমাধানযোগ্য সমস্যা দেওয়া হল। দেখা গেল প্রথম দল ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাবশত প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে।

যেসব ছাত্রছাত্রী সাফল্য অপেক্ষা বার বার ব্যর্থ হয়েছে তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় অর্জিত অসহায়ত্বের ধারণার দ্বারা। এই অসহায়ত্বের অভিজ্ঞতা এড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সাফল্যের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) নতুন কোনো বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা

(খ) নতুন বিষয় শিখনে ব্যর্থতা

(গ) প্রক্ষোভজনিত সমস্যা—হতাশা, অবসাদ, প্রেষণা সঞ্চারে বাধা সৃষ্টি করে।

(১২) অভ্যাস (Habit) : অভ্যাস গঠনের প্রাথমিক স্তরে অভ্যাস আমাদের প্রেষণাকে প্রভাবিত করে। Alport এর মতে অভ্যাস আমাদের আচরণের গতি নির্ধারণ করে, প্রেষণ ক্রিয়ার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

(১৩) অবচেতন মন (Unconscious mind) : ফ্রয়েডের মানসিক সক্রিয়তা সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের অবচেতন মনই হল আমাদের আচরণের নিয়ন্ত্রক যা ব্যক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। অবচেতন মনের অবদমিত ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, প্রেষণা, অনুভূতি বা তাড়না যেগুলি আপাত সুস্থ বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে, এগুলিই সংগতি বিধানের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এই অর্থে অবচেতন মন প্রেষণার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

(১৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-determination) : আত্মনিয়ন্ত্রণ হলো এক প্রকার চাহিদা বা অভিজ্ঞতার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের তাড়নায় বাহ্যিক চাপ ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যক্তির প্রেষণ ক্রিয়ার অন্যতম নির্ধারক হিসেবে পরিগণিত হয়।

১২.৬ সারাংশ (Summary)

বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে মনোবিজ্ঞানে প্রেষণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। প্লেটো বলেছেন, প্রেষণা এমন একটি আভ্যন্তরীণ শক্তি যার মূলে আছে মানুষের স্বাধীন চিন্তা। মনোবিদ অ্যাটকিনসন বলেছেন, প্রেষণা এমন একটি প্রবণতার অভিব্যক্তি যা এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। প্রেষণা ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণার উপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এখনও অবধি ২৪টির মতো তত্ত্ব তৈরী করেছেন।

এই অধ্যায়ে চারটি তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে যথা ম্যাক্লিল্যাণ্ডের প্রেষণার তত্ত্ব, ম্যাসলো-এর আত্মপ্রকাশ সংক্রান্ত তত্ত্ব, সাফল্যলাভের তত্ত্ব, বার্নার্ড ওয়াইনারের কারণ নির্দেশক তত্ত্ব। প্রেষণাকে উদ্‌বোধকের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হয় যথা অভ্যন্তরীণ প্রেষণা এবং বাহ্যিক প্রেষণা। এছাড়া প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রেষণাকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা—ব্যক্তিগত প্রেষণা, সামজিক প্রেষণা, শারীরিক প্রেষণা। প্রেষণ ক্রিয়ার পেছনে কতগুলি শর্ত কাজ করে যেগুলি প্রেষণ ক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে থাকে। এগুলিকে আমরা প্রেষণ ক্রিয়ার নির্ধারক বলে অভিহিত করে থাকি। এই অধ্যায়ে প্রধান প্রদান কয়েকটি নির্ধারক এর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন কৌতূহল, অনুরাগ, উদ্বেগ, আকাঙ্খার স্তর, উদ্বোধক, আত্মক্ষমতা, মূল্যবোধ, সফলতা, শ্রেণী পরিবেশ, অভ্যাস, অবচেতন মন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

১২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. প্রেষণা বলতে কি বোঝেন?

২. প্রেষণার তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।

৩. শ্রেণীকক্ষে প্রেষণার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন।

৫. প্রেষণার প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলি কি কি?

৬. প্রেষণা কয় প্রকার ও কি কি?

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

Nath, D.C., Bhatta, N.K., (2022) Study Material PG Education, Paper-2 (Beng) Modules : 1 & 2, NSOU, Kolkata

ঘোষ, সনৎ কুমার, শিখনে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (২০১৪), ক্লাসিক বুক্স, কোলকাতা

Banerjee, J., Nag, S., Dutta, G., Psychology of Learning and instruction (2007), Rita Book Agency, Kolkata.

Pal, D., Pal, A., Pandey, P., (2018), Educational Psychology, Rita Publication, Kolkata.

পর্যায়-৫

মানসিক স্বাস্থ্য

(Mental Health)

একক ১৩ ❑ মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (Mental Health and Mental Hygiene)

গঠন **(Structure)**

১৩.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১৩.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা **(Concept of Mental Health)**

১৩.৪ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Mental Health)**

১৩.৫ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান **(Mental Hygiene)**

১৩.৫.১ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ধারণা **(Concept of Mental Hygiene)**

১৩.৫.২ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Mental Hygiene)**

১৩.৬ সারাংশ **(Summary)**

১৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

১৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি পাঠের পরে শিক্ষার্থী

- মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিধি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য ও উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে পরিবারের ভূমিকাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবেন।

১৩.২ ভূমিকা (Introduction)

একজন মানুষের সম্পূর্ণ সুস্থতা কেবলমাত্র শারীরিক সুস্থতা দিয়ে বিচার করলে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ শরীর এবং মন এই দুই নিয়েই একজন মানুষের সম্পূর্ণ সুস্থতা বিচার করা হয়। শারীরিক অসুস্থতা যেমন মনের/মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে তেমনি খারাপ মানসিক পরিস্থিতিও ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ মানুষের সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতারও গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করব। মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়।

১৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা (Concept of Mental Health)

ব্যক্তির নিজের সঙ্গে এবং বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে চলাই হলো সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্য কথাটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন স্বাস্থ্য একটি পরিপূর্ণ ইতিবাচক ধারণা, পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক ভালো থাকার অনুভূতি, শুধুমাত্র রোগ বা ব্যধির অনুপস্থিতি নয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্য একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা, শরীর ও মনের সুস্থতার সম্মিলিত অবস্থা।

WHO (World Health Organization)-এর মতে মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির এক ধরনের অবস্থা যার সাহায্যে ব্যক্তি তার নিজস্ব সক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক চাপকে সামলাতে পারে। কার্যকরীভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং সে তার সম্প্রদায়ের বা সমাজের জন্য অবদান রাখতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির জীবনের সকল ক্ষেত্রে (সামাজিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, প্রাক্ষোভিক) ভারসাম্যযুক্ত অবস্থা, যা ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে ভারসাম্যযুক্ত রাখে।

ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাগুলোর পরিপূরণ। অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তির চাহিদা যখন তৃপ্ত হয়, তখন ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানে সমর্থ হয় এবং তার মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে।

আমাদের জন্মগত ও অর্জিত প্রবণতাগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতিবিধান করে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য অভিমুখী পরিপূর্ণ ও স্বাধীন আত্মপ্রকাশই হল মানসিক স্বাস্থ্য।

১৩.৪ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mental Health)

মানসিক স্বাস্থ্য দেহ ও মনের এক প্রকার অবস্থা।

মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখিত সংজ্ঞা এবং অন্যান্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

● মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির এক ধরনের মানসিক অবস্থা।

● এটি ব্যক্তির এক ধরনের সক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

● মানসিক স্বাস্থ্য হল মানসিক দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা, মানসিক চাপ, হতাশা প্রভৃতি মোকাবিলায় সহায়ক উপাদান।

● মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনো কিছুর 'চরম মাত্রা' অবশ্যই ক্ষতিকর।

● প্রত্যেক ব্যক্তির পেশায় সন্তুষ্টি তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এক অপরিহার্য শর্ত।

● সমাজ অনুমোদিত ব্যক্তির আচার-আচরণ যা ব্যক্তির নিজের সঙ্গে এবং সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সংগতিবিধানে সহায়ক যা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

● নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা—মানসিক সুস্থ ব্যক্তি নিজের আত্ম প্রকৃতি এমনভাবে গঠন করেন যা অনেকটা তার প্রকৃত স্বরূপের কাছাকাছি কিন্তু ইতিবাচক।

● পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারণা-আমাদের পরিবেশের চারিপাশে যা আছে তাকে সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন করাটাই সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

● আর্ন্তব্যক্তি সম্পর্ক (Inter personal Relation) : পারস্পরিক মেলামেশা, আদান-প্রদান ইত্যাদির ওপর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নির্ণয় করে। মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি এই ধরনের আদান প্রদানকে গুরুত্বহীন মনে করে। ফলে আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

● সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক সুস্থতা প্রয়োজনীয়।

● সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য ব্যক্তির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

● মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি বয়স অনুযায়ী প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য অর্থাৎ সংগত, উপযুক্ত ও সমাজ অনুমোদিত প্রাক্ষোভিক আচরণ করে থাকে।

● উদ্বেগ প্রবণতা ব্যক্তিত্বের সংহতি নষ্ট করে।

● মানসিক দ্বন্দ্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেয় না। ফলে হঠকারী সিদ্ধান্ত বিপদ ডেকে আনে।

● মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে গুঢ়ৈষার অনুপস্থিতি ও দ্বন্দ্বের সীমিত প্রকাশ দেখা যায় এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে সংহত বলে সকলেই বুঝতে পারে।

● খাদ্যগ্রহণে অনীহা, নিদ্রাহীনতা, অস্বাভাবিক নিদ্রা, অখাদ্যভোজন, অযৌক্তিক তীব্র ভয়, বাধ্যতামূলক চিন্তা, আবেগের অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে বোঝা যায় ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। এইসব লক্ষণের উপস্থিতি ব্যক্তির আচরণকে অন্যের কাছে অস্বাভাবিক করে তোলে।

১৩.৫ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene)

১৩.৫.১ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ধারণা (Concept of Mental Hygiene) :

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত আলাপ-আলোচনা বা অনুশীলনই হলো মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সর্বদা মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা নিয়েই অনুশীলন করে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র বিষয়গত শাখা যা মনোরোগ বিদ্যার একটি অংশ এবং এর আলোচনার বিষয়বস্তু হল মানসিক স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, রোগের মাধ্যম, চিকিৎসা ইত্যাদি নিয়ে। ক্রো এবং ক্রো (Crow & Crow) এর মতানুসারে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এক ধরনের বিজ্ঞান যা মানবকল্যাণ ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষা উভয়েই ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সমাজে সার্থক সংগতি স্থাপনে সহায়তা করে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলেও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়।

মনোবিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনোচিকিৎসা-বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একটি শিক্ষাশ্রয়ী কর্মসূচী।

শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশায় উপযুক্ত মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যুক্ত।

সর্বোপরি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হলো স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ কতগুলি সাধারণ তত্ত্ব ও সূত্র।

১৩.৫.২ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mental Hygiene) :

● মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হল এক ধরনের বিজ্ঞানের শাখা

● মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানসিক রোগ বা ব্যধি নিয়ে আলোচনা করে, সঙ্গে সঙ্গে এটি তার নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করে।

● এটি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

● মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিশুর মানসিক সুস্থতা অনুযায়ী সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়বস্তু ঠিক করে দেয়।

● শুধু পরিবার নয়, কোনো শিশুর বিদ্যালয় তার বিকাশের উপর কী প্রভাব ফেলে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে যেমন পিতামাতা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের আচরণের প্রকৃতির উপর শিশুর মানসিকস্বাস্থ্য নির্ভর করে তেমনি পরিণত বয়সে তার কর্মক্ষেত্র ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে সে যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তার যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও আলাপ আলোচনা করে থাকে।

● এটি মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষার একটি কৌশল।

● এটি ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার উপায় নিরূপণ করে।

● মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রয়েছে নিজস্ব পরামর্শ ও নির্দেশনা শুধু শিশু নয়, শিক্ষক নয়, সমগ্র সমাজজীবনের সুস্থতা বিষয়ক আলোচনা এবং সচেতনতা সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্ম প্রচেষ্টা।

● এটি ব্যক্তিকে মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে সচেতন করে ও জ্ঞান দান করে।

১৩.৬ সারাংশ (Summary)

মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির জীবনের সকল ক্ষেত্রে (সামাজিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, প্রাক্ষোভিক) ভারসাম্যযুক্ত অবস্থা যা ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে ভারসাম্যযুক্ত রাখে।

ব্যক্তির মানসিক সুস্বাস্থ্যের পরিচয় আমরা কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পেতে পারি।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ধারণাটি একটি বিস্তৃত ধারণা। মানসিক স্বাস্থ্য হল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি অংশ যার পরিধি বিস্তৃত নয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কাজ হল ব্যক্তি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে রক্ষণাবেক্ষণ, মানসিক রোগকে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক শৃঙ্খলা হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য হল একটি উপশাখা। প্রত্যেক ব্যক্তির অসুস্থতার কারণ লুকিয়ে আছে তার নিজের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে। অসুস্থতা সৃষ্টিকারক কিছু উপাদান বা অবস্থার কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?

২. মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি আলোচনা করুন।

৩. মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কগুলো আলোচনা করুন।

৪. মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন।

৫. মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

Nath, D.C., Bhatt, N.K., (2022) Study Material, PG Education Paper-2 (Beng) Modules : 1 & 2, NSOU, Kolkata.

ঘোষ সনৎকুমার, শিখনে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, (২০১৪) ক্লাসিক বুকস, কোলকাতা।

একক ১৪ ❑ সংগতিবিধান বা অভিযোজন (Adjustment)

গঠন **(Structure)**

১৪.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১৪.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১৪.৩ সংগতিবিধানের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ **(Concept, Characteristics and Symptoms of Adjustment)**

১৪.৩.১ সংগতিবিধানের ধারণা **(Concept of adjustment)**

১৪.৩.২ সংগতিবিধানের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of adjustment)**

১৪.৩.৩ সংগতিবিধানের লক্ষণ **(Symptoms of adjustment)**

১৪.৪ সংগতিবিধানের কৌশল ও প্রয়োজনীয়তা **(Techniques and needs of adjustment)**

১৪.৪.১ সংগতিবিধানের কৌশল **(Techniques of adjustment)**

১৪.৪.২ সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা **(Need of adjustment)**

১৪.৫ সংগতিবিধানে-পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা **(Role of Family and School for adjustment)**, সংগতি বিধান ও মানসিক স্বাস্থ্য **(Adjustment and Mental Health)**

১৪.৫.১ সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা **(Role of family and school for adjustment)**

১৪.৫.২ সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক **(Relation between Adjustment and Mental Health)**

১৪.৬ সারাংশ **(Summary)**

১৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

১৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে তা হল—

- সংগতিবিধান ও অভিযোজন সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে।

- সংগতিবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- উত্তম সংগতিবিধানের লক্ষণগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন।
- সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা কি তা অনুধাবন করবেন।
- সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্কগুলি বুঝতে পারবেন।
- সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকাগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।

১৪.২ ভূমিকা (Introduction)

প্রত্যেক সমাজের কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার এবং বিধিনিষেধ থাকে যাদেরকে কেন্দ্র করে যেখানে একটা সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্য দিয়েই সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সমাজ এগিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি ও চাহিদা থাকে। প্রতিটি মানুষ তার প্রবৃত্তি ও চাহিদার নিবৃত্তির তাড়নায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। এই চাহিদাগুলি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন— দৈহিক, জৈবিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি। এই চাহিদার উদ্রেক ও তার সন্তুষ্টি বিধানই হলো অভিযোজন বা সংগতিবিধান। মনোবিজ্ঞানীরা সংগতি বিধানের বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সংগতিবিধান বলতে বোঝায় আমাদের তাড়না এবং প্রবৃত্তিকে একটি ভারসাম্য যুক্ত অবস্থানে রাখা।

বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সংগতিবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হয়েছে। উত্তম সংগতিবিধানের লক্ষণ এবং সংগতি বিধানের কৌশল, সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা এবং সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্কগুলি এখানকার আলোচ্য বিষয়। সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে পরিবার ও বিদ্যালয় এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা যা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১৪.৩ সংগতিবিধানের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ (Concept, Characteristics and Symptoms of adjustment)

১৪.৩.১ সংগতিবিধানের ধারণা :

সংগতিবিধান বলতে ব্যক্তির আচরণগত পদ্ধতিতে বোঝায়, যার সাহায্যে ব্যক্তি তার বিভিন্ন চাহিদাগত দ্বন্দ্ব ও চাহিদাপূরণের বিভিন্ন বাধার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে যে কৌশলের সাহায্যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে তাকেই সংগতিবিধান বলা হয়। ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতিবিধান করতে পারলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে আর সংগতিবিধানে অক্ষম হলে ব্যক্তির মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টি হয়।

সংগতিবিধানের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকজন মনোবিদের মন্তব্যকে তুলে ধরা হল :

ওয়েবস্টার (Webster) বলেছেন—সংগতিবিধান বলতে বোঝায় ব্যক্তির সম্পর্কের সন্তোষজনক অবস্থানকে যার দ্বারা সে মানিয়ে বা খাপ খাইয়ে নেয় বা অভিব্যক্তি করে। গেটস্ ও জারসিল্ড (Gates & Jersild) এর মতে কৌশল বা সংগতিবিধান হল একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির আচরণের মূল উৎসকে পরিবর্তিত করে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশ দ্বারা। Carter V Good (1959) বলেছেন—পরিবেশ উপযোগী বা পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে আচরণ করা বা পরিবেশকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াই হল অভিযোজন। Vanhalloc (1970) বলেছেন জীববিদ্‌গণের কাছে অভিব্যক্তি যে অর্থে শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত, মনোবিদগণের কাছে অভিযোজন সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুষ্ঠ সংগতিবিধান হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি সাফল্যের সঙ্গে তার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করে এবং সঠিক আচরণগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদার মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। সংগতিবিধানের ধারণা আরও স্পষ্ট করতে গেলে এর দুটি দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংগতিবিধান বা অভিযোজন হল সাফল্য বা পারদর্শিতা। দ্বিতীয়তঃ এটি একটি প্রক্রিয়া। প্রথম ক্ষেত্রে সংগতিবিধানের গুণগত মাত্রার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রতি জোর দেওয়া হয়।

সংগতিবিধানের মনোগতিবিদ্যাগত ধারণা (Psychodynamic Concept of adjustment) : সংগতিবিধানের মনোগতিবিদ্যাগত ধারণা বলতে সাধারণতঃ মনঃসমীক্ষণের (Psycho analytic) ব্যাখ্যাকে নির্দেশ করা হয়। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী উত্তম সংগতিবিধানে সক্ষম ব্যক্তি ঈদ, অহম্ এবং অধিসত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে এবং সে তার জৈবিক, যৌক্তিক এবং সামাজিক সত্তার মধ্যে ভারসাম্য রেখে নিজেকে সুস্থ ভালোবাসার সম্পর্কে সংযুক্ত রাখতে সক্ষম হয় এবং কার্যকরী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ব্যক্তি ইগো বা অহম যখন এই সামঞ্জস্য বিধান সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করতে সক্ষম হয় না তখন ব্যক্তির মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণের প্রশংসা পায়।

১৪.৩.২ সংগতিবিধানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Adjustment) :

বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সংগতিবিধানের যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হল—

- সংগতিবিধান হল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া।
- সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ শিশু বা ব্যক্তির সংগতিবিধানের অন্যতম শর্ত।
- আদর্শ বিদ্যালয় পরিবেশ একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর চাহিদার পূরণ ঘটাবে তেমনি অন্যদিকে সংগতিবিধানের যথাযথ কৌশল আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে। প্রকৃত সহাবস্থানের প্রশিক্ষণ দেবে।
- এর সাহায্যে ব্যক্তির চাহিদা ও পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

- সদর্থক সংগতিপূর্ণ ব্যক্তি জীবন দর্শনের মাধ্যমে চলার পথ নির্দেশ করবে।
- উত্তম অভিযোজন সম্পন্ন ব্যক্তি সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ এবং মূল্যবোধ মেনে চলার মধ্য দিয়ে সমাজের সমর্থন চায়।
- উপযুক্ত মাত্রার উচ্চাকাঙ্খা থাকবে।
- উপযুক্ত পরিমাণে নিরাপত্তাবোধ এবং আত্মমর্যাদা সে রক্ষা করে চলবে।
- ছিদ্রান্বেষী হবে না।
- প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে সরে না এসে দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করবে।
- উত্তম অভিযোজনসম্পন্ন ব্যক্তি চারিদিকের পরিবেশকে সহজভাবে গ্রহণ করবে।

১৪.৩.৩ সংগতিবিধানের লক্ষণসমূহ (Symptoms of adjustment) :

যে ব্যক্তি তার পরিবেশর সঙ্গে উত্তমরূপে সংগতিবিধান করতে সক্ষম তার আচরণগত কিছু বৈশিষ্ট্যই তার পরিচয় বহন করে—

(i) উত্তম সংগতিবিধানে সক্ষম ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং খামতি উভয় সম্পর্কেই সচেতন হয় অর্থাৎ সে জানে কোন কাজ সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে করতে পারবে আর কোন্ কাজে তার আত্মবিশ্বাসের খামতি আছে।

(ii) উত্তম সংগতিবিধানে সক্ষম ব্যক্তির নিজের প্রতি যেমন আত্মসম্মানবোধ থাকে। তেমনি সে অন্যদেরকেও সম্মান দেখাতে জানে।

(iii) এই ধরনের ব্যক্তির কোনো কিছুর প্রতি খুব বেশী উচ্চাশা বা কোনো কিছুতে খুব বেশী হতাশা হয় না।

(iv) এই ধরনের ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাগুলোর পরিপূরণ হয় বলে এদের আচরণ বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক হয়। এদের আচরণে কোনো জটিলতা থাকে না বা এদের মনোভাব কোনো লোক দেখানো বিষয়ের উপস্থিতি থাকে না।

(v) জীবনের সকল ক্ষেত্রে এদের আচরণগত নমনীয়তা দেখা যায়।

(vi) এই ধরনের ব্যক্তিরা জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

(vii) এদের পৃথিবীর প্রতি বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে।

(viii) এই ধরনের ব্যক্তিরা সর্বদা তার পরিবেশের প্রতি সচেতন থাকে।

১৪.৪ সংগতিবিধানের কৌশল ও প্রয়োজনীয়তা (Techniques and need of Adjustment)

১৪.৪.১ সংগতিবিধানের কৌশল (Techniques of adjustment) :

ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মধ্যে কিছু কৌশল ব্যক্তি সচেতনভাবে করে থাকে যাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কৌশল আর কিছু ব্যক্তি অসচেতনভাবে কৌশল করে থাকে। যাকে অপ্রত্যক্ষ কৌশল বলা হয়। নিম্নে বিশেষ বিশেষ কিছু সংগতিবিধানের কৌশলের কথা উল্লেখ করা হল। যেমন—

(i) ভালো করার চেষ্টা (Effort to improvement) : যে কোনো পরিস্থিতিতে এটি ব্যক্তির প্রথম প্রচেষ্টা। ব্যক্তি কোনো সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সংগতিবিধানের জন্য ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভালো করার চেষ্টা করে।

(ii) মানিয়ে চলা (Compromising): ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোনোর পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হলে, ব্যক্তিটি তার কৌশলের হেরফের করে যখন পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌঁছোয় তখন তাকে মানিয়ে নেওয়া বলা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল প্লেনে করে দিল্লি যাবে। দেখা গেল তার সময়ের সঙ্গে প্লেনের সময় ঠিক হচ্ছে না। সে প্লেন বাদ দিয়ে ট্রেনে করে দিল্লি গেল। অর্থাৎ সে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিল।

(iii) আত্মসমর্পণ (Surrender): কোনো সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি প্রচেষ্টার পরেও সমস্যার সমাধান না পারলে পরিস্থিতির কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে অভিযোজনের চেষ্টা করে। উল্লিখিত অভিযোজনের কৌশলগুলি ব্যক্তি সচেতনভাবে গ্রহণ করে বলে এই কৌশলগুলি প্রত্যক্ষ সংগতিবিধানের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপ্রত্যক্ষ সংগতিবিধানের কৌশলের উল্লেখ করা হল এগুলিকে Defense Mechanism-ও বলে।

(iv) সাধারণ অস্বীকার (Simple Denial): ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হল যা বিপদের কারণ হতে পারে তা অস্বীকার করা। যেমন—পথে দেখা পরিচিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলার কারণ হিসাবে ব্যক্তি বলে সে পরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পায় নি। অস্বীকার সমস্যার সম্মুখীন হওয়াতে স্থগিত রাখতে সাহায্য করে।

● অবদমন (Repression) ব্যক্তির যেসব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার সামাজিক স্বীকৃতি থাকে না, ব্যক্তি সেগুলিকে মনের অবচেতন অংশে পাঠিয়ে দেয়। একে অবদমন বলে।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) এটি হল অবচেতনভাবে পিছিয়ে যাওয়া। যখন ব্যক্তি তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন সে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্বের সুখকর স্মৃতিকে মনে করে বা আচরণগত পরিবর্তন করে।

● পরিপূরণ (Compensation) কোনো একটি বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঘাটতি থাকলে অন্য ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে সে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে। সে অন্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে। কোনো চাহিদার অপূর্ণতার ফলে ব্যক্তির মধ্যে যদি হতাশা দেখা যায় সেক্ষেত্রে অন্য চাহিদা সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করে হতাশাজনিত মানসিক চাপ ব্যক্তি কাটিয়ে উঠতে পারে। খেলাধূলায় উৎকর্ষতার দ্বারা শিক্ষার্থী অনেক সময় লেখাপড়ার ঘাটতি পূরণ করে।

পরিপূরণ প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) প্রত্যক্ষ পরিপূরণ (Direct Compensation) : এখানে ব্যক্তি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা দুর্বল ক্ষেত্রগুলিতে উৎকর্ষতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ গণিতে দুর্বল শিক্ষার্থী যখন প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের দ্বারা গণিতে উৎকর্ষতা অর্জন করে তখন তা হল প্রত্যক্ষ পরিপূরণ।

(খ) অতিপূরণ (Over Compensation) : এখানে ব্যক্তি তার দুর্বল ক্ষেত্রটিতে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা অতি উৎকর্ষতা অর্জন করে। যেমন—অল্প বয়সে দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের দ্বারা পরিণত বয়সে নৃত্যে অত্যন্ত পারদর্শী হয়েছে।

(গ) পরিবর্তিত পরিপূরণ (Substitute Compensation) : যখন কোনো ব্যক্তি একটি দিকের দুর্বলতা অন্য দিকে সফলতা অর্জনের দ্বারা পূরণ করে তখন তাকে পরিবর্তিত পরিপূরণ বলে। যেমন—লেখাপড়ায় দুর্বল ছাত্র খেলাধূলায় দক্ষতা অর্জন করে।

(ঘ) অপ্রত্যক্ষ পরিপূরণ (Indirect Compensation) : অপ্রত্যক্ষ পরিপূরণের একটি সাধারণ উদাহরণ হল—পিতামাতা তাদের অক্ষমতা পুত্রকন্যাদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে পূরণ করার প্রয়াসী হন।

(ঙ) নেতিবাচক পরিপূরণ (Negagive Compensation) : যখন ব্যক্তি তার ব্যর্থতাকে সাধারণভাবে পরিপূরণে সক্ষম না, হয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করে যা তার পক্ষে শুভ নয় তাকে বলা হয় নেতিবাচক পরিপূরণ। উদাহরণস্বরূপ একজন দুর্বল ছাত্র বারবার পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল করতে না পারায় অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে।

● **অপব্যাখ্যান (Rationalisation) :** এই ধরনের কৌশলে ব্যক্তি নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য যে বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছে তার অপব্যাখ্যা দিয়ে ব্যর্থতার কারণ বোঝানোর চেষ্টা করে।

● **অলীক কল্পনা (Fantasy) :** ব্যক্তি তার ব্যর্থতার গ্লানি থেকে বাঁচতে অলীক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সংগতিবিধান করতে চায়।

● **উন্নীতকরণ (Sublimation) :** উন্নীতকরণ হল পরিপূরণ কৌশল শ্রেণীর। অভিযোজন কৌশলগুলির

সর্বোৎকৃষ্ট হল উন্নীতকরণ। এর সাহায্যে অসামাজিক আচরণগুলি সামাজিক সমর্থন যোগ্য হয়ে ওঠে। অধ্যবসায়ী, গবেষক, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নীতকরণের অবদান আছে। নৃত্যকলা, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি উন্নীতকরণের ফল।

● **অভেদীকরণ (Indentification) :** এখানে ব্যক্তি নিজেকে অপর কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় একাত্মবোধ করে। বয়সন্ধিক্ষণে শিক্ষার্থীরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। অভেদীকরণ অনেক সময় সচেতন প্রক্রিয়া হতে পারে। ব্যক্তি সচেতনভাবেই তার আদর্শ ব্যক্তিকে অনুকরণ করে যার ফলে সে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়।

● **প্রতিক্ষেপণ (Projection) :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত অভিযোজন প্রক্রিয়া হল প্রতিক্ষেপণ। নিজের পরাজয়, ভুলভ্রান্তি অন্যের উপর চালিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় প্রতিক্ষেপণ। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে কম নাম্বার পায় এমন ছাত্র যখন বলে মাষ্টারমশাই ভীষণ কড়া হাতে খাতা দেখেছেন তখন এটি প্রতিক্ষেপণেরই উদাহরণ। আর একটি দিক হল, এখানে ছাত্র যখন শিক্ষক বা অন্য ছাত্রকে ঘৃণা করে তখন তার ধারণা হয় সেই শিক্ষক বা সেই ছাত্রই তাকে ঘৃণা করছে। অর্থাৎ ব্যক্তি অন্যের প্রতি যে আচরণ করছে, সে মনে করে অন্যরাও তার প্রতি সেই আচরণ করছে। প্রতিক্ষেপণের মাত্রাধিক ব্যবহার অপসংগতির কারণ হয়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction formation) : প্রতিক্রিয়া সংগঠনকে বিপরীতমুখী সংগঠনও বলা হয়। ব্যক্তির অসামাজিক ইচ্ছা গোপন করার জন্য যখন সে ইচ্ছার বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করে বা ব্যক্তি তার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তার যে ধরনের আচরণ করা উচিত ছিল তার বিপরীত ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে তখন তাকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলে। প্রচণ্ড বদমেজাজী ব্যক্তি নিজের হিংসাত্মক আচরণেও ভীত হয়ে বিনীত আচরণ করে। এই সবই বিপরীত প্রতিক্রিয়া সংগঠনের উদাহরণ।

উপরোক্ত অপ্রত্যক্ষ মনস্তাত্ত্বিক কৌশলগুলি ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ এবং সচেতনভাবে গৃহীত কৌশলের কথা উল্লেখ করা যায় এগুলি হল—

(ক) অধিক সক্রিয়তা (Hyper activity)

(খ) সমঝোতা (Compromise) পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি অনেক সময় নিজের সঙ্গে সমঝোতা করে।

(গ) সঠিক পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Correct Choice and decision making) ব্যক্তি যখন কোনো দ্বন্দ্বমূলক বা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে গিয়ে সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিকল্পগুলিকে পর্যালোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়।

১৪.৪.২ সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা (Needs of adjustment) :

- আমাদের জীবনে সংগতিবিধানের ভূমিকা বিভিন্নমুখী। যেমন—পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী প্রত্যেকের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান, ভাব বিনিময়, সামাজিক অনুষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার সামাজিক সংগতিবিধান করে থাকে। সার্থক ও সুখী জীবনযাপনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হল সংগতিবিধান। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন সকল ক্ষেত্রেই সংগতিবিধান অপরিহার্য।
- বর্তমান সমাজে সামাজিক মর্যাদা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সবই অর্থনৈতিক সংবিধানের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত বৃত্তি পাওয়া এবং সন্তোষজনকভাবে সেই বৃত্তি অনুসরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির বৃত্তিমূলক সংগতিবিধানের মধ্যে পড়ে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যক্তিজীবনে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক বৃত্তিমূলক সংগতিবিধান করে থাকে।
- ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার জন্য যথাযথ সংগতিবিধানের প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পরিবেশের প্রেক্ষিতে শারীরিক দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায় বৌদ্ধিক-প্রোক্ষোভিক ইত্যাদি দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে তখনই সে সুস্থ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন নির্ভর করে তার মানসিক সুস্থতার ওপর।
- সাংস্কৃতিক সংগতিবিধান ব্যক্তির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে উন্নত করে ও সমৃদ্ধ করে। সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণের পথকে সুগম করে।
- ব্যক্তি জীবনের সুস্থতা ও সাফল্য আনতে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সার্থক সংগতিবিধান খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
- ব্যক্তির যে কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ সংগতিবিধান। ব্যক্তি তার পরিবেশ বা ক্ষেত্রের সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতি বিধান করতে পারলে দ্রুত তার সফলতার লক্ষ্য পূরণ হবে।
- ব্যক্তির কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্যও সংগতিবিধান প্রয়োজন। কোনো পরিবেশে ব্যক্তি সঠিকভাবে সংগতিবিধান করতে পারলে সে তার কাজ স্বাধীনভাবে করার সুযোগ পায় এবং নিজের সৃজন প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে কর্মদক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।
- সার্থক সংগতিবিধান ব্যক্তির মানসিক চাপ (stress) ও উত্তেজনা (tension) প্রশমনে সহায়তা করে। শারীরিক ও মানসিক সাম্যবস্থা নিয়ে আসে যা ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- সংগতিবিধান ব্যক্তির সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষায় শুধুমাত্র সহায়তা করে তা নয়; সংগতিবিধানের

মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নতি বিধান সংঘটিত হয়। ব্যক্তি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেমন সংগতিবিধান প্রক্রিয়া সচল থাকে তেমনি সমাজ পরিবেশের অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ আজ তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন ঘটিয়েছে। মানব সভ্যতার এই অগ্রগতি সবই সার্থক ও সুষ্ঠু সংগঠিত বিধানেরই ফল।

- কোনো বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করার জন্য শিখন পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে সংগতিবিধানের প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনায় সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা কিছু ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল। মানবজীবনের সমস্ত কাজেই সংগতিবিধানের প্রয়োজন। সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ক্ষুণ্ণ হবে।

১৪.৫ সংগতিবিধান-পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Family and School for Adjustment) সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্য (Adjustment and Mental Health) :

১৪.৫.১ সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Family and School for adjustment) :

সংগতিবিধানে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিশু যত বেশী পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে অভ্যস্থ হয় ততই তার গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শিশুকে সামাজিক ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তোলে। শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে সঠিকভাবে পূরণের ব্যবস্থা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু বা শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতিবিধান করতে পারে অথবা শিশুর বা শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো অপসংগতি মূলক আচরণ যাতে তৈরি না হয় তার জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

- শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুস্থ, স্বাভাবিক, নিরাপদ ও আনন্দদায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিশুর জন্য যথাযথ খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু যখন বন্ধুদল নির্বাচন করবে তখন পিতা-মাতা ও শিক্ষক উভয়কেই সচেতন থাকতে হবে।
- শিশুর সমস্ত ধরনের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে সামাজিক পথে নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা হল শিশুর মধ্যে মূল্যবোদের বিকাশ সাধন করা। তাই বিদ্যালয়ে শিশুর মূল্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে যাতে কোনো অপসংগতিমূলক আচরণ তৈরি না হয়।
- দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য এক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা যার সাহায্যে সামাজিক ও ব্যক্তিত্ব সংগতিবিধান করতে পারে। সংগতিবিধান একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে একজন ব্যক্তি চাহিদা ও পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনে। একজন ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগতিবিধানের ওপর ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত, দৈহিক, সামাজিক, মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্য সুসম্পর্কিত। আমরা বলতে পারি মানসিক স্বাস্থ্য যা ব্যক্তিত্বের কর্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, সেটি এক্ষেত্রে কারণ (cause) এবং একইভাবে অভিযোজন যা আচরণের সঙ্গে যুক্ত সেটি হল ফলাফল (effect)। মানসিক স্বাস্থ্য হল কারণ এবং সংগতিবিধান হল ফলাফল।

১৪.৫.২ সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Adjustment and Mental Health) :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-এর মতে স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক এই তিন অবস্থার একটি সুস্থ সমন্বয়। স্বাস্থ্যের অন্যতম উপাদান হল মনের সুস্থতা বা মানসিক স্বাস্থ্য। মানুষের চিন্তা আবেগ ও আচরণ এই তিন মিলেই হল মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অন্যথায় পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিয়ে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করাই হল অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরিবর্তিত পরিবেশে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকাই হল অভিযোজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অভিযোজন এক ধরনের আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। সুতরাং একটি হল ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও অন্যটি হল আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য যদি অন্তর্মুখী হয় তবে তার মধ্যে বিশেষ কিছু আচরণ প্রকাশ পাবে।

দুটি বিষয় বা চলকের (variable) মধ্যে সম্পর্ক আমরা দুরকম ভাবে ভাবতে পারি। একটি সহগতির সহগাঙ্ক দিয়ে ও অপরটি কার্য্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে। আমরা দেখব মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতিবিধান এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টি ফলাফল। আমরা বলতে পারি মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি সমাজ ও পরিবারের সাথে সংগতিবিধান করতে পারে না। যখন একটি মানসিক চাপযুক্ত জীবন অতিবাহিত করে তখন সে অপসংগতিবিধানের আওতায় পড়ে। Stress যা মোকাবিলা করা হয় না তা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ না হলে সমন্বয়ের সমস্যা।

১৪.৬ সারাংশ (Summary)

সংগতিবিধানের ধারণা স্পষ্ট করতে গেলে দুটি দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অভিযোজন হল সাফল্য বা পারদর্শিতা। দ্বিতীয়তঃ এটি একটি প্রক্রিয়া। প্রথম ক্ষেত্রে সংগতি বিধানের গুণগত মাত্রার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রতি জোর দেওয়া হয়। অভিযোজনের কৌশলগুলির বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হয়েছে। সংগতিবিধানে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে সংগতিবিধানের সক্ষম ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়। এই অধ্যায়ে সংগতিবিধানের দুই রকম কৌশল যথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এর উল্লেখ করা হয়েছে। সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সংগতিবিধান প্রয়োজন। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সার্থক সংগতিবিধান খুবই প্রয়োজন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি সবই সার্থক ও সুষ্ঠু সংগতিবিধানের ফল। সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে পরিবারও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক স্বাস্থ্য ও অভিযোজন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, একটি কারণ অন্যটি ফলাফল।

১৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. সংগতিবিধানের সংজ্ঞা দিন।

২. সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তাগুলি কি কি?

৩. সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্কের ধারণা লিখুন।

৪. অভিযোজনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫. সংগতিবিধানের কৌশলগুলি কি কি?

১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70.

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Ghosh, Sanat Kumar, (2022). Self Learning Material, HED, Education, CC-ED-04 (Bengali) NSOU, Kolkata.

ঘোষ, সনৎকুমার, শিক্ষায় সংগতি-অপসংগতি এবং নির্দেশনা (২০১২) ক্লাসিক বুক্স, কোলকাতা।

মণ্ডল, জগদিন্দ্র (২০০৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা।

একক ১৫ ❑ অপসংগতি (Maladjustment)

গঠন **(Structure)**

১৫.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১৫.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১৫.৩ অপসংগতি **(Maladjustment)**—ধারণা **(Concept)**, শ্রেণিবিভাগ **(Type)**

১৫.৩.১ অপসংগতির ধারণা **(Concept of Maladjustment)**

১৫.৩.২ অপসংগতির শ্রেণিবিভাগ **(Types of Maladjustment)**

১৫.৪ অপসংগতি নির্ণয় করার পদ্ধতি **(Method of Identifying Maladjustment)**

১৫.৫ অপসংগতির কারণসমূহ **(Causes of Maladjustment)**

বিদ্যালয়ে শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণ **(Maladjusted behaviour in school children)** অপসংগতি নিবারণে শিক্ষকের/অভিভাবকের ভূমিকা **(Role of Teacher/ Gurdian to Prevent Maladjustment)**

১৫.৫.১ অপসংগতির কারণসমূহ **(Causes of Maladjustment)**

১৫.৫.২ বিদ্যালয়ে শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণ **(Maladjusted behaviour in School Children)**

১৫.৫.৩ অপসংগতি নিবারণে শিক্ষকের/অভিভাবকের ভূমিকা **(Role of Teacher/Gurdian to Prevent Maladjustment)**

১৫.৬ সারাংশ **(Summary)**

১৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Bibliography)**

১৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে তা হল—

- অপসংগতি কাকে বলে সেই প্রসঙ্গে ধারণা অর্জন করবেন।
- অপসংগতির বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন।

- অপসংগতিগুলো কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তা বুঝতে পারবেন।
- অপসংগতি কিভাবে নির্ণয় করা যায় তা জানতে পারবেন।
- অপসংগতি প্রতিরোধে পিতামাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা কি সে বিষয়ে অবগত হবেন।

১৫.২ ভূমিকা (Introduction)

অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি আমাদের আশেপাশে যেসব লোক থাকে তাদের মধ্যে কারও কারও কিছু খারাপ অভ্যাস থাকে। যেমন—কাউকে কাউকে আমরা মিথ্যা কথা বলতে দেখি, কেউ সবার সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ সব কিছুতেই না বলে, কেউ খুব ভীরু হয়। এদের এই আচরণগুলো স্বাভাবিক নয়। বিদ্যালয়ে শিশুরা নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে চিৎকার চেঁচামেচি করে, মারামারি করে, বই খাতা চুরি করে। এই ধরনের আচরণগুলি সমাজ স্বীকৃত নয়। এগুলিকে অপসংগতিমূলক আচরণ বলা হয়। ব্যক্তির অপসংগতি সৃষ্টির মূলে রয়েছে ব্যক্তি জন্মগত ও পরিবেশগত উপাদান যেগুলিকে আমরা উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। শিক্ষকেরা অপসঙ্গতির প্রাথমিক অবস্থা কীভাবে নির্দিষ্ট করবেন তা আলোচিত হবে। অপসঙ্গতির প্রধান আচরণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

নিদানমূলক কারণ এবং উপস্থিত কারণ। শৈশবের সমস্যামূলক আচরণ সমূহকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—বিকাশজনিত এবং আচরণগত। অপসংগতি শিক্ষার ক্ষতি কিভাবে করে এবং অপসংগতি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তা আমাদের আলোচনা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। আচরণগত সমস্যা অধিক হলে শিক্ষার্থীকে মানসিক চিকিৎসক বা কাউন্সিলরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষক, পিতামাতাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

১৫.৩ অপসংগতির ধারণা ও প্রকারভেদ (Concepts and Type of Maladjustment)

১৫.৩.১ অপসংগতির ধারণা :

সংগতির বিপরীত হল অপসংগতি। সংগতিপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। —ব্যক্তির চাহিদা, চাহিদা পূরণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে তৃপ্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সার্থক অভিযোজনমূলক আচরণ। অপসংগতি বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায়। এদের মধ্যে সাধারণ চাহিদা আছে কিন্তু চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তারা তৃপ্ত হয় না এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক আচরণ করতে সক্ষম হয় না। এইচ ডব্লু বার্নার্ড (H. W. Bernard) বলেছেন—"Adjustment or Maladjustment is dependent upon the extint to which fundamental needs of human beings are not or on the way it being met" অর্থাৎ সংগতিবিধান অথবা অপসংগতি নির্ভর করে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাগুলো কীভাবে পরিপূরণ হচ্ছে অথবা চাহিদা পূরণের উপায়ের ওপর। অপসংগতি বলতে সেই ধরনের কাজকে বা কাজের ফলাফলকে বোঝায় যা আচরণগত সংগতির অভাবে ঘটে।

Crow and Crow এর মতে যে আচরণের দ্বারা ব্যক্তির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে দেখা যায় তাই হল অপসংগতি। ফ্রয়েড অপসংগতি বলতে বুঝিয়েছেন এরূপ একটি অবস্থানকে যখন ব্যক্তির 'ঈদ', 'অহম', এবং 'অধিসত্তার' মধ্যে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়।

অপসংগতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

- অপসংগতিমূলক আচরণ ব্যক্তিকে সামাজিক উপযোগী করে তুলতে ব্যর্থ হয়।
- অপসংগতি ব্যক্তির জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে।
- অপসংগতি পূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজবিরোধী আচরণের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।
- অপসংগতির ফলে ব্যক্তির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে ব্যক্তি ব্যতীক্রমী আচরণ করে।

  অতিরিক্ত মাত্রায় নির্দিষ্ট কিছু আচরণ অপসংগতির লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

দৈহিক লক্ষণ : তোতলামি, কথা আটকে যাওয়া, আঙুল চোষা, বমি করা, সর্বদা অস্থিরভাব।

আচরণগত বিচ্যুতি : আক্রমনধর্মী, কারণে অকারণে মিথ্যা কথা বলা, অতিরিক্ত কাজ করা ইত্যাদি।

প্রাক্ষোভিক লক্ষণ : অত্যধিক ভয়, হীনমন্যতা, বদমেজাজ, দ্বন্দ্ব, মানসিক চাপ ইত্যাদি।

১৫.৩.২ অপসংগতির প্রকারভেদ (Types of Maladjustment) :

1980 সালে American Psychiatrist Society মানসিক ব্যধির শ্রেণিবিভাগ করেন এবং তার নামকরণ করেন DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) 1987 সালে DSM-III কে DSM-III R নাম দেওয়া হয়।

1994 সালে WHO এবং American Psychiatrist Association বিভিন্ন AXIS (Multi Axiual System) এ অপসংগতিমূলক আচরণকে শ্রেণিবিভাগ করে এবং নাম দেয় DSM-IV। DSM-IV এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটি বিভিন্ন প্রকার অপসংগতি বা মানসিক গোলযোগকে কেবল একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত না করে 5টি অক্ষে (AXIS) ভাগ করে শ্রেণিভুক্তকরণ। এর অর্থ হল ব্যক্তির অপসংগতি বা গোলযোগকে একটি মাত্রার প্রেক্ষিতে বিচার না করে বিভিন্ন মাত্রা বা অক্ষের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা যায়। এই 5টি অক্ষ হল—

মানসিক ব্যধির শ্রেণিবিভাগ (DSM - IV, 1994)

AXIS-I	**AXIS-II**	**AXIS-II**	**AXIS-IV**	**AXIS-V**
Clinical disorder	Personality disorder	General Medical Conduction	Psychological Environmental disorder	Global assessment disorder

ব্যক্তির আচরণে যখন ভারসাম্যহীন বা সমাজস্বীকৃত নয় এরূপ আচরণের প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তিকে আমরা বলি অপসংগতিপূর্ণ বা সংগতিবিহীন ব্যক্তি বা Maladjusted person। আমরা আমাদের সমাজে এরূপ কিছু ব্যক্তির আচরণ দেখতে পাই যারা সংগতিপূর্ণ এবং সংগতিহীন উভয় আচরণের মাঝামাঝি কোনো আচরণ করে। তাদের আচরণকে আমরা অসংগতিমূলক (Non-adjustive) আচরণ বলি। বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণের রূপ বা ধরন এখানে উল্লেখ করা হল।

আচরণগত সমস্যা (Conduct Disorder) : অবাধ্যতা, বিশৃঙ্খলাকারী, মারামারি ও ঝগড়া করা, প্রভুত্ব করা, বদমেজাজ, আক্রমণাত্মকতা, যৌন অপরাধ, শয্যামূতাভাব।

ব্যক্তিত্বের সমস্যা (Personality Disorder) : অপসারণ, উদ্‌বেগ, হতাশা ও হীনমন্যতা, অপরাধী ভাবা, লজ্জিতভাব, ভীরুতা, অসুখী।

অপরিণমনগত সমস্যা (Immaturity Disorder) : মনোযোগের পরিধির স্বল্পতা, অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়তা, ঋণাত্মকতা, দিবাস্বপ্ন, বয়সে ছোটো খেলার সাথী।

সামাজিক অপরাধ (Socialized Delinquency) : স্কুল পালানো, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অপরাধমূলক দলে যোগদান, পদার্থের (ড্রাগ) অব্যবহার।

১৫.৪ অপসংগতি নির্ণয় করার পদ্ধতি (Methods of Identifying Maladjusted)

অপসংগতি নির্দিষ্টকরণে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত উপায়ে শিক্ষকরা অপসংগতির প্রাথমিক অবস্থা নির্দিষ্ট করতে পারেন।

(ক) পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকার : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে, শ্রেণীকক্ষের বাইরে, খেলার মাঠে, পাঠাগারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করার পর যাদের তিনি অপসংগতিমূলক শিক্ষার্থী বলে অনুমান করেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।

(খ) অভীক্ষার সাহায্যে : অপসংগতিমূলক শিক্ষার্থী নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য হল Bell adjustment Inventory (বেলের অভিযোজন সংক্রান্ত ইনভেন্টরি) এই অভীক্ষার দ্বারা জীবনের বিভিন্ন দিকে (গৃহ পরিবেশ, শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, বিদ্যালয় ও সামাজিক পরিস্থিতিতে) সংগতির মাত্রা পরিমাপ করা যায়। রজারের ব্যক্তিত্ব অভিযোজনের অভীক্ষা (Rogger’s Test of Personality Development); সংগতিপূর্ণ ও অপসংগতি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষক এই অভীক্ষাটি ব্যবহার করতে পারেন। টেলরের দুশ্চিন্তা পরিমাপক স্কেল (Taylor’s Anxiety Scale) : যে সমস্ত শিক্ষার্থী অত্যাধিক দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয় তাদের নির্দিষ্টকরণে এই অভীক্ষাটি ব্যবহার করা হয়।

অভিযোজন এবং বিভিন্ন দিকগুলি পরিমাপের জন্য বর্তমানে যেসব অভীক্ষা আছে তাদের অধিকাংশই বিদেশে প্রস্তুত যার আর্থ সামাজিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১৫.৫ অপসংগতির কারণসমূহ (Causes of Maladjustment), অপসংগতিমূলক আচরণ (Maladjusted behaviour in School/Children), অপসংগতি নিবারণে শিক্ষকের/অভিভাবকের ভূমিকা (Role of Teacher/Gurdian to prevent maladjustment)

১৫.৫.১ অপসংগতির কারণ (Causes of Maladjustment) :

অপসংগতির কারণগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) নিদানমূলক কারণ (Precipitating cause)

(2) উপস্থিত কারণ

● নিদানমূলক কারণ-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) জিনগত ত্রুটি : জিন বিজ্ঞানীরা জিনের মধ্যে কতগুলি উপাদান আবিষ্কার করেছেন যা অপসংগতির কারণ।

(খ) দৈহিক গঠন : শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠন, চেহারা, মুখাবয়ব এবং এগুলি সম্পর্কে ব্যক্তির মূল্যায়ন তার সংগতিবিধানে প্রভাব বিস্তার করে।

(গ) শারীরিক বঞ্চনা : অন্ধত্ব, বধিরতা, পঙ্গুত্ব, দীর্ঘ অসুস্থতা ব্যক্তির সংগতিবিধানে বাধার সৃষ্টি করে।

উপস্থিত কারণ (Pre disposing causes) : উপস্থিত কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) মনোসামাজিক কারণ : গৃহ পরিবেশ এবং অপসংগতি এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দারিদ্র্য, বিপর্যস্ত পরিবার, পিতামাতার অত্যাধিক প্রত্যাশা, সন্তানের প্রতি পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, পালিত সন্তান, পিতামাতার কঠোর শাসন, পিতামাতার অস্বাভাবিক আচরণ।

(খ) সামাজিক কারণ : নিম্নলিখিত সামাজিক কাররগুলি শিশুর মধ্যে অপসংগতির কারণ হতে পারে।

ধর্মীয় বিশ্বাস, সংগঠন, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার এবং সুষ্ঠুভাবে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থার অভাব, গতিশীলতা অর্থাৎ পিতামাতার একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করা, শ্রেণী পার্থক্য অর্থাৎ সুবিধাভোগী এবং সুবিধাভোগী নয় এই রকম শ্রেণী, বৃত্তি সম্পর্কীয় নিরাপত্তাবোধের অভাব।

(গ) মানসিক কারণ : ফ্রয়েড ও তার অনুগামীদের মতে সংগতিবিধান ও লিবিডোর বিকাশ পরস্পর সম্পর্কিত। লিবিডো বিকাশের কোনো একটি স্তরে যদি সংবন্ধন ঘটে তখন অপসংগতির পরিচয় বহন করে।

(ঘ) শিক্ষাগত কারণ-এর উল্লেখযোগ্য হল—প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, কঠোর শাসন, পক্ষপাতমূলক আচরণ।

(ঙ) বিদ্যালয় ঘটিত কারণ : বিদ্যালয়ের পরিবেশ, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, উপযুক্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এবং অবসর বিনোদনের সুযোগের অভাব, শ্রেণিকক্ষে সবাই যদি একত্রে না থেকে উপদলে বিভক্ত হয় তাহলে নিজেদের মধ্যে অশান্তি দেখা দেয়, শিক্ষা প্রশাসক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক, মূল্যায়নের পদ্ধতি, পরামর্শ দানের অভাব।

(চ) সহপাঠীগত কারণ : সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, খোলামেলা ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের অভিযোজনে বিশেষ সহায়ক। এর অভাবে শিক্ষার্থীদের উপর চাপের সৃষ্টি করে যা অপসংগতিমূলক আচরণের কারণ হয়ে ওঠে।

১৫.৫.২ বিদ্যালয়ের শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণ (Maladjusted behaviour in School Children) :

(ক) বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যারা সামান্য কারণে ঝগড়া করে, মারামারি করে।

(খ) এমন অনেক ছেলেমেয়েদের দেখি যাদের অভ্যাস সহপাঠীদের বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, টিফিন বাক্স, ছাতা প্রভৃতি চুরি করা।

(গ) অনেক ছেলেমেয়েকে দেখা যায় শাস্তির ভয়ে কারণে-অকারণে মিথ্যা কথা বলে।

(ঘ) ভীরুতা একধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপসংগতির উদাহরণ। অতিরিক্ত শাসন-এর প্রভাবে ছাত্ররা শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে কোনো গোলমাল করে না। তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাসা বাঁধে। বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তি সত্ত্বার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

(ঙ) বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় পিতামাতা ও বাড়ির নিকটজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থেকে শিশুদের মধ্যে সংগতিবিধানের সমস্যা দেখা যায়।

(চ) শিশুর বাক্‌রুদ্ধতা তাকে কথা বলা ক্ষমতায় থাকে না। সে তোতলায়, আমতা আমতা করে।

(ছ) বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাছে ভালোবাসা না পেলে শিশুর মনে ভয় সঞ্চার হয়। আত্মবিশ্বাসের অভাব জাগ্রত হয়।

(জ) বিদ্যালয়ে প্রাক্ষোভিক সুপরিবেশের অভাবে শিশুরা নানারকম অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

(ঝ) আর্থিক অসংগতির কারণে শিশুদের মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দেয় তার ফলে অসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে।

(ঞ) শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে অপসংগতিমূলক আচরণ করে।

(ট) অনেক শিক্ষার্থীকে সব সময় অস্থির ভাব দেখা যায়।

(ঠ) জ্ঞানমূলক দিক থেকে অপসংগতিমূলক আচরণের কিছু লক্ষণ দেখা যায়—নিজেরা নির্ধারিত কাজে মনোযোগ দিতে পারে না।

- মনোসামাজিক দিক থেকে যে লক্ষণ দেখা যায় তা হল মানসিকতা সর্বদা হতাশা ব্যঞ্জক থাকে কারও মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক কথা বলে।
- অপরের খেলাধূলায় বাধা সৃষ্টি করে।
- সব কাজে তাড়াহুড়া করে।
- দৈনন্দিন কার্যাবলীতে প্রায়শই ভুল করে।

১৫.৫.৩ অসংগতি নিবারণে শিক্ষকের/অভিভাবকের ভূমিকা (Role of Teacher/Gurdian to prevent maladjustment) :

বিদ্যালয় হলো শিশুর সামাজিকীকরণের প্রধান জায়গা। গৃহ পরিবেশের পরই শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা, চাহিদা, ক্ষমতা প্রভৃতি অনুযায়ী শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বিদ্যালয়ে খুবই প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দানের অভাবের জন্য কৈশোরকালীন ছেলেমেয়েরা বিপথে চালিত হয়।

- খেলাধূলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, নাটক, আবৃত্তি, বিতর্ক, গানবাজনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সৃজনী শক্তির বিকাশের জন্য শিক্ষক প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন।
- ত্রুটিমুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব দূর করে ইতিবাচক মনোভাব গড়তে শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
- শিক্ষকের উচিত শিক্ষায় সফলতা প্রাপ্ত শিশুদের স্বীকৃতি দেওয়া, সফল কাজের প্রশংসা করা। এতে ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, জীবন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে।
- বিদ্যালয়ের প্রাক্ষোভিক পরিবেশ যাতে শিক্ষার্থীর বিকাশের সহায়ক হয় সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত।
- শিশুর যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন চাহিদাকে উদ্‌গমনের সাহায্যে কীভাবে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা যায় তা শিক্ষককে জানতে হবে।
- কৈশোরকালীন ছেলেমেয়েদের মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য একজন আদর্শ শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, সুষম ব্যক্তিত্ব, পেশাগত নিরপেক্ষতা প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনোরকম আক্রমণাত্মক আচরণ গড়ে উঠেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের আক্রমণাত্মক আচরণ চিহ্নিত হলে শিক্ষকের উচিত সঠিক কারণ নিরুপন করা।
- শিক্ষক শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করবেন।
- আচরণগত সমস্যা অধিক হলে শিক্ষার্থীকে মানসিক চিকিৎসক বা কাউন্সিলরের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু গ্রুপ নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দেবেন।
- শিক্ষার্থীর কর্ম পরিবেশ বা বিদ্যালয় পরিবেশকে অভিযোজন উপযোগী করতে হবে।
- শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা খুব বেশি সময় একাকিত্ব অনুভব না করে।
- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সর্বদা নিয়োজিত রাখতে হবে যাতে তাদের মধ্যে অবসাদ গ্রস্ততা তৈরি হওয়ার সুযোগ না থাকে।
- শিক্ষার্থীদের আনন্দ উপভোগের দিকে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে যাতে ছাত্রসংখ্যা মাত্রাধিক না হয় সেদিকে শিক্ষকদের নজর দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য শিক্ষকদের সজাগ থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীতে পরামর্শদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের অপসংগতিমূলক আচরণে সহপাঠীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়।
- সৃষ্টিধর্মী কাজে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়। শিক্ষার্থী যাতে বিদ্যালয়ে হাতেনাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করার সুযোগ পায় সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অসংগতিনিবারণে পিতামাতা বা অভিভাবকের ভূমিকা (Role of parents or gurdians to prevent maladjustment)

গৃহ পরিবেশ বিশেষ করে পিতামাতা শিশুর বিকাশে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশু তার গৃহ পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিক মিথষ্ক্রিয়া না ঘটলে শিশুর মধ্যে ব্যতিক্রমী আচরণ দেখা যায় যা অবশেষে অপসংগতির কারণ হয়ে ওঠে।

- পিতামাতা যদি পৃথকভাবে বসবাস করে, শিশুদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং অপসংগতিমূলক আচরণ করে। পিতামাতা বা অভিভাবকের উচিত গৃহপরিবেশে সুস্থ। স্বাভাবিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সজাগ থাকা।
- পিতামাতা শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বিবেচনা না করে অত্যাধিক প্রত্যাশা যেন না করে। পিতামাতা শিশুর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে তার কার্য্য ক্ষমতার ওপর।
- অভিভাবকরা পুত্র, কন্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করেন অন্যথা অন্যদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ সৃষ্টি হবে যা অপসংগতিকে ত্বরান্বিত করে।
- পালিত সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। পিতামাতা যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখেন তার মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে।
- অমনোযোগী চঞ্চল শিশুদের মনঃসংযোগে অক্ষমতা দেখা যায়। কিছু কিছু অবাঞ্ছিত আচরণ—বিশেষ করে অবাধ্যতা ও অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা যায়। এদের চিকিৎসার জন্য অভিভাবকদের ধৈর্য রাখতে হবে।
- যে সমস্ত শিশুদের খাওয়ানো কঠিন, তাদের প্রতিকারের জন্য পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসা, প্রয়োজন।
- মিথ্যা কথা বলা শিশুদের একটি অপসংগতিমূলক আচরণ এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন অভিভাবকের কর্তব্য হল শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের সহায়তা করা, ভয় দূর করা পরিবেশের পরিবর্তন ও মনোচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা।
- শিশুদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব, অবাধ্যতা এবং একগুঁয়েমি মনোভাব দেখা যায়। গৃহে পিতামাতা বা অভিভাবকের অবহেলা স্নেহ ভালোবাসার অভাবের জন্য এই অসংগতিমূলক আচরণ দেখা যায়। অভিভাবকরা শিশুদের অবহেলা থেকে বিরত থাকবেন।
- জোর করে শিশুর ওপর চাপ সৃষ্টি না করে শিশুকে বুঝিয়ে ভালোবেসে প্রয়োজনীয় কাজ করানো বাঞ্ছনীয়
- শিশুদের নীতিবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকের সজাগ থাকতে হবে।
- চাকরিরত পিতামাতার সন্তানদের জন্য সময় দেওয়া দরকার না হলে পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ সর্বদা পায় না বলে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা তৈরি হয়।

আমরা জানি কৈশোরকালীন শিক্ষার মূল কথাই হলো সহানুভূতি ও স্নেহভালোবাসার স্পর্শ। এটাকে মাথায় রেখে গৃহ পরিবেশের উন্নয়ণ, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার উন্নয়ণ ঘটাতে পারলে অপরাধ প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে সমাজ থেকে নির্মূল করা যাবে। সহযোগীতা ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে উঠবে।

১৫.৬ সারাংশ (Summary)

পরিবেশের সাথে সংগতি স্থাপনের অক্ষমতাকে অপসংগতি বলা হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির অপসংগতি সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ ব্যক্তির কিছু জন্মগত ও পরিবেশগত উপাদান। এই অধ্যায়ে আমরা অপসংগতির বিভিন্ন কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। ব্যক্তির মধ্যে তৈরি হওয়া অপসংগতিমূলক আচরণ আমরা বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারি। অপসংগতি নির্দিষ্টকারণে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয়ের আবহাওয়া, পাঠক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলী মূল্যায়ন পদ্ধতি উপর লক্ষ্য দেওয়া দরকার অপসংগতি দূরীকরণের জন্য। শারীরিক বা মানসিক কোনো দুর্বলতা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

১৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. অপসংগতির সংজ্ঞা দাও।

২. অপসংগতির বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করো।

৩. অপসংগতির কারণ হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করো।

৪. আমরা অপসংগতি কি কি ভাবে নির্ণয় করবো।

৫. বিদ্যালয়ে শিশুদের অপসংগতির আচরণগুলি কী কী?

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008). Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.

Mangal, Dr. S. K. (1998). Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana, 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California

Community College, Santa Clarita Community College District & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002). Modern Educational Psychology, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

মণ্ডল, জগদিন্দ্র (২০০৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা।

ঘোষ, সনৎকুমার, শিক্ষায় সংগতি-অপসংগতি এবং নির্দেশনা (২০১২) ক্লাসিক বুক্স, কোলকাতা।

Nath, D. C., Bhatt, N. K., (2022) Self Learning Material, PG Education, Paper-2 (Beng) Modules 1 & 2, NSOU, Kolkata.

NOTES